পুরুষোত্তম

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাব্লিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩২৮

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

দশ টাকা

জাদুকণ্ঠ

শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

চাঁদের কাছাকাছি
পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি
কোণে মনে বনে
ডাকতে জানলে
সেই আমি সেই তুমি
প্রতিবিম্বিতা
নতুন তুলির টান
হৃদয়ের পথে খুঁজো
প্রণয় পাশা
আলোর ঠিকানা
হঠাৎ সেদিন
আর এক সাজে
অমনিবাস
দ্বীপায়ন
পিক্ পয়েন্ট
মীনা রাখি ও সাধিকা
কাল-তুমি আলেয়া
শিলাপটে লেখা
একজন মিসেস নন্দী
রাগশর
বাজীকর
জানালার ধারে
পঞ্চতপা
অন্য নাম জীবন
উত্তর বসন্তে
বিদেশিনী
সাঁঝের মল্লিকা
নিষিদ্ধ বই
নগশৃঙ্গার
শ্রেষ্ঠ গল্প
বলাকার মন

রূপের হাটে বিকিকিনি
মেঘের মিনার
সিকেপিকেটিকে
অপরিচিতের মুখ
খনির নতুন মণি
দুটি প্রতীক্ষার কারণে
আনন্দরূপ

কারণে অকারণে
রাধাচূড়ার বাঁশী
তোমার জন্য
সোনার কাঠি রূপোর কা
যার যেথা ঘর
নগর পারে রূপনগর
শত রূপে দেখা
মালবী মালঞ্চ
আবার আমি আসব
সমুদ্র সফেন
ফেরারী অতীত
কাঞ্চনরাগিণী
ঘর
একাকী জোনাকি
আমি সে ও সখা
নগর দর্পণে
সাবরমতী
দুজনার ঘর
অলকাতিলকা
সাত পাকে বাঁ
রাত্রির ডাক
চলো জঙ্গলে যাই
প্রতিহারিণী
বকুল বাসর
স্বয়ংবৃতা
রোশনাই
নব নায়িকা
মনমধুচন্দ্রিকা
সারি, তুমি কার?
পরিণয়ম্
চলাচল

পুরুষোত্তম

কলকাতা থেকে মাদ্রাজ—ট্রেনে এই লম্বা দু-রাতের পথে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোট দু'ঘণ্টাও কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। লোকটি স্বল্পভাষী কিন্তু শ্রোতা ভালো। দর্শক বোধহয় আরো ভালো। তার চারপাশে যেন দেখার বস্তু ছড়িয়ে আছে। টানা কালো দু'চোখ দূরের দিকে প্রসারিত হলে কিছুটা বিমনা আর নিরাসক্ত দেখায়। সে-চোখ কাছে এসে মুখের ওপর বসলে মনে হবে ভিতরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নিতে পারেন। চাউনিটা তখন থমকে যাওয়ার মতো ঝকঝকে। কিন্তু ধারালো নয়। বরং একটু হাসির ছোঁয়া-লাগা কৌতুকমাখা।

অবশ্য সহযাত্রী সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণে কিছুটা ভুল হয়ে গেছে সেটা পরে অনুভব করেছি। পরে বলতে মাদ্রাজে পৌঁছনোরও বেশ পরে। তখন মনে হয়েছে ভদ্রলোক ইচ্ছে করলেই প্রিয় ও অপ্রিয়ভাষী হতে পারেন। আর টানা কালো চোখের হাসিমাখা চাউনিও হঠাৎ সজাগ তীক্ষ্ণ এমন কি কঠিনও হয়ে উঠতে পারে। সে পরের প্রসঙ্গ। কিন্তু ট্রেনের এই দু'দিনের পথটুকুর মধ্যেই আমি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম।

আমার কাছে মানুষটার প্রধান আকর্ষণ ওই দুটো চোখ। মুখের দিকে তাকালে সবার আগে নজরে আসে। আমার ধারণা সকলেরই প্রাণ-সত্তার আসল প্রতিনিধি তার দুটো চোখ। কামনা বাসনা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রেম প্রীতি ঘৃণা রাগ অনুরাগ প্রভৃতির যাবতীয় প্রবৃত্তির লীলা মনের দরজা দিয়ে নিজের অগোচরে ওই চোখের দরিয়ায় এসে মেশে। দেহের কাঠামোর নিভৃতের অধিবাসীটিকে শুধু তার দুটি চোখের তারা থেকে চেনা যেতে পারে। এ-জানা সত্ত্বেও চোখে পড়ার মতো চোখ

খুব বেশি দেখি না। সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে মনে হল দেখলাম।

ট্রেন নড়ার পাঁচ মিনিট আগেও কে যাত্রী কে-বা নয়, বোঝার উপায় ছিল না। আত্মজনদের যারা তুলে দিতে এসেছিল, তাদের অনেকেই ভিতরে উঠে এসেছে। ফলে ভিতরে ঠাসাঠাসি ভিড়। মেয়েকে সঙ্গে করে আমার স্ত্রীও স্টেশনে এসেছিলেন। চার সপ্তাহের প্রোগ্রামে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা তাঁর মনঃপূত ছিল না আদৌ। অনেকবার বলেছেন, বয়েস হয়েছে এখনো এত ঘোরাঘুরির বাতিক কেন!

কিন্তু তাঁর দিক থেকে জোরালো বাধা আসার পথ আমি আগেই মেরে রেখেছি। স্ত্রীর সুবিবেচনার ওপর আস্থা রেখে তাঁকেও সঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। রাজি হলে এ প্রোগ্রাম বাতিল করতে হত কিনা জানি না। কিন্তু তিনি আশাপ্রদভাবেই আমন্ত্রণ নাকচ করেছেন। বলেছেন, তোমার না-হয় ভাবনা-চিন্তা নেই, হুট করে বেরিয়ে পড়লেই হল, এত বড় মেয়ে রেখে আমি যাই কি করে, ওর য়ুনিভার্সিটি বন্ধ থাকলেও না-হয় সব একসঙ্গে বেরুনোর কথা ভাবা যেত।

মেয়ে বরং আমার স্বপক্ষে ওকালতি করেছে। বলেছে, বাবার মাঝে মাঝে এ-রকম বেরিয়ে পড়া দরকার, সব-সময় যে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তার কি মানে আছে—না বাবা, তুমি ভেবেছ যখন বেরিয়ে পড়ো।

এবারের বেরুনোটার মধ্যে একটু লোভনীয় বৈশিষ্ট্য আছে। আমি যাচ্ছি এক নামী পর্যটন সংস্থার সঙ্গে। সত্তর আশীজনকে নিয়ে যাকে বলে কনডাকটেড টুর প্রোগ্রাম। চার সপ্তাহের মেয়াদে সমস্ত দক্ষিণ ভারত ঘুরিয়ে আনবে। এই পর্যটন সংস্থার সুনাম শোনা ছিল। ঝোঁকের বশে এবারে ঝুলে পড়লাম। থোকে টাকা দিয়ে খালাস, আহার-বিহার শয়ন যাবতীয় ব্যবস্থার দায় এঁদের। এ-বয়সে এটাই সুবিধের ব্যাপার মনে হয়েছিল।

এভাবে বেরিয়ে পড়ার পিছনে আরো একটু আগ্রহ ছিল। নিজেকে সাধারণ দশ-জনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তারই মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভবঘুরের মতো পথে-প্রান্তরে দিন যাপনের আনন্দ থেকে আমি দীর্ঘকাল বঞ্চিত। এ-আনন্দের স্বাদটুকু একই প্রবৃত্তির সতীর্থ ভিন্ন আর কাউকে বোঝানো যাবে না। কনডাকটেড টুর বা পর্যটন-যাত্রা ঠিক সেই গোছের না হলেও কাছাকাছি গোছের হতে পারে ভেবেছিলাম।

কিন্তু যাত্রার শুরুটাই কেমন বেখাপ্পা রকমের হয়ে গেল। স্ত্রীর চোখে এমন কি মেয়ের চোখেও বিসদৃশ ঠেকল। এই বয়সের বেড়ানোটা আরামপ্রদ হবে না, এ তারা ভাবেনি। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে মেয়ে চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল, আমার থেকে ওরই যেন ডবল অস্বস্তি। আর তার মা ওর দিকেই যে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার তাৎপর্য, সব কথায় যে সায় দিস সব-সময়—এই লোকের কাণ্ড দেখ্ একবার—।

ঠিক এ-রকমটা হবে আমিও ভাবিনি। ভেবেছিলাম এখান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত পর্যটন দলের যাত্রীরা সত্তর-পঁচাত্তর জনের একটা স্লীপার কোচে ঠাঁই পেয়ে যাবে। আর মাদ্রাজ পেঁ।ছনোর পরে তো ভাবনাই নেই। সেখানে সংস্থার ছোট লাইনের আলাদা টুরিস্ট কোচই পেয়ে যাব। কিন্তু কর্মকর্তারা যে এভাবে এখান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করেছেন কি করে জানব। সহযাত্রীরা কে-যে কোন স্লীপার কোচে আর সব সাধারণ যাত্রীর সঙ্গে মিলে-মিশে আছে হদিস পাওয়া দায়। তাছাড়া প্রত্যেকটা কম্পার্টমেণ্ট অনেকগুলো কিউবিকলএ ভাগ করা। ফলে এক কম্পার্টমেণ্টএর এ-মাথা ও-মাথায়ও যে পর্যটন-সহযাত্রীরা আছেন তাঁদেরও চেনা-জানা ভার।

কিছুদিন আগের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোই এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু নাম অনুযায়ী মানের বদল কিছু হয়নি। এ-রকম গুমটে জগা-খিঁচুড়ি অবস্থায় দু'রাত কাটাব কি

করে স্ত্রী আর মেয়ের সম্ভবত সেই ভাবনা। আমার সে-দুশ্চিন্তা আদৌ নেই, মনে মনে ভাবছি ট্রেনটা নড়ার সময় হলে বাঁচি। তবু ওদের একটু ঠাণ্ডা করার জন্য বললাম, নিচের পুরো বার্থটাই পেয়েছি, গাড়ি ছাড়লে কোনো অসুবিধে হবে না···আর মাদ্রাজে পৌঁছে গেলে তো কথাই নেই, সেখান থেকে সুন্দর সব সেপারেট অ্যারেঞ্জমেণ্ট।

শুনে স্ত্রীর দু'কান কটকট করে উঠল বোধহয়। বললেন, এখান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত আলাদা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে মাদ্রাজ থেকেই সেই সর্বসুন্দরের মধ্যে গিয়ে পড়লে হত না!

মেয়ে কিছু না বললেও মনে মনে মায়ের কথাতেই সায় দিচ্ছে বোঝা গেল। বিয়ের আগে তো বটেই পরেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত আমি ট্রেনের তিন দাগের খদ্দের ছিলাম। স্লীপার কোচে চার টাকার বাড়তি মাশুল গুণে রাতে ঘুমোবার মতো একটা বেঞ্চ পেলেই খুশি। ক্রমে পদস্থ হবার ফলে সেই দিনগুলো স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই ভুলে গেছেন। আর মেয়ে তো সেদিনের খবরই রাখে না।

—জলের কনটেনারটা কোথায়? সঙ্গের জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলোবার পর স্ত্রীর অপ্রসন্ন দৃষ্টি আমার মুখের ওপর থমকালো।

আমি হাঁসফাঁস করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। বাড়ি থেকে গাড়িতে ওঠার সময়ে ওটা আমার হাতে ছিল বলে মনে পড়ল না।

—দেখলি? স্ত্রীর হালছাড়া দু'চোখ আবারও মেয়ের মুখের ওপর।—সতের ঘাটের জল খেয়ে ফিরতে হবে কিনা এবার বুঝলি? গাড়ি ছাড়তে আর বাকি কত, ড্রাইভার গিয়ে চট করে নিয়ে আসতে পারবে?

জলের অভাবে আমি যেন বেঘোরে মারা পড়তে চলেছি এমনি মুখ দুজনেরই। তাড়াতাড়ি বললাম, ক্ষেপেছ। আর দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছাড়বে—কিছু ভাবতে হবে না, স্টেশনে কিছু একটা কিনে নেব, আর মাদ্রাজ পৌঁছতে পারলে আর কিছু দরকারও হবে না।

বলা সত্ত্বেও জলের অভাবে আমি জলে পড়ব না, এমন আশ্বাস গ্রহণে দুজনেরই আপত্তি। মেয়ে বলল, আমি এখানেই কিছু পাই কিনা দেখি তাহলে—

ধমকের সুরে তার মা বললেন, তাই দেখ্।

অগত্যা হাত ধরে মেয়েকে আমি জোর করে আমার বার্থএ বসিয়ে দিলাম।—এই ভিড়ে কিছু দেখার দরকার নেই, বোস চুপ করে। স্ত্রীকে বললাম, কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ—আমার একটুও অসুবিধে হবে না বলছি তো।

এ-রকম গলা না চড়ালে এদের সঙ্গে পারা মুশকিল। এবারে ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দুজনেই চুপ খানিক। একটু বাদে স্ত্রী মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রত্যেক জায়গায় পৌঁছেই একখানা করে চিঠি যেন আসে বলে দে—

বলতে হল না। আমার কানে স্পষ্টভাবেই গেছে কথাগুলো। বললাম, দেব।

পাঁচ মিনিট আগে ঘণ্টা বেজে ওঠার পর দুজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত আমি। যাচ্ছি মাত্র চার সপ্তাহের জন্যে, কিন্তু গাড়িটা ছাড়তে মনটা ওদের জন্যেই হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে গেল। মানুষ এমনিই মায়াবদ্ধ বটে।

গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে যাবার পর মিনিট দশ পর্যন্ত সহযাত্রীরা যে যার গোছগাছে ব্যস্ত থাকল। আমার তাড়া নেই কিছু। জানালার ধারের সিঙ্গ্‌ল বার্থখানা পেয়েছি। একটু রাত হলে হোল্ড-অল খুলে নিলেই হল।

আমার মাথার ওপরের বাঙ্কএ অর্থাৎ আপার সিঙ্গল বার্থএ এতক্ষণ কে বসেছিল চেয়েও দেখিনি। আমাকে জানান দিয়ে এবারে ওপর থেকে একজন নামলেন।—বসি একটু, কি বলেন···।

একদিকে সরে গিয়ে বললাম, হ্যাঁ বসুন।

আসলে ঘুমনোর আগের সময় পর্যন্ত নিচের বার্থগুলো দুজন-

তিনজনেরই সীট। ওপরের বার্থএর মালিক সমস্তক্ষণই ওপরে বসে থাকবে না।

আসন নিয়ে ভদ্রলোক সোজা তাকালেন আমার দিকে। প্রথম বিবেচনায় চাউনিটা বেশ স্বচ্ছ অথচ গভীর মনে হল। চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বয়েস। পরে শুনেছি আটচল্লিশ। উঁচু লম্বা সুপুরুষ। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে ধপধপে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী। হাতের পুষ্ট কব্জিতে দামী সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড। জামায় মিনেকরা সোনার বোতাম। হাতের আঙটিটায় কি পাথর জানি না, লাল জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে।

সুপুরুষ এবং শৌখিন পুরুষ।

আসন নিয়েই আলতো গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, জল খাবেন এখন ?

প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেলাম একটু। ওপর থেকে গৃহিণীর আচরণ লক্ষ্য করেছেন বোঝা গেল। অপরিচিত কেউ তাই নিয়ে রসিকতা করবে ভাবা যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের হাবভাবে রসিকতার লক্ষণ নেই। জবাব শোনার আগেই আবার বললেন, আমার সঙ্গে বড় ওয়াটার কনটেনার আছে, আপনার অসুবিধে হবে না।

গলার আওয়াজটিও বেশ। হালকার সঙ্গে গাম্ভীর্যের মিশেল। হেসে বললাম, ওপর থেকে আপনি তাহলে সবটুকুই দেখেছেন আর শুনেছেন ?

জবাব না দিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর আবার সোজা মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একলা না বেরিয়ে আপনার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিলেন না কেন ?

আলাপের শুরুতেই খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন নয়। অসুবিধের কথাটা বললাম। মেয়ে একলা থাকবে।

—মেয়ে কি পড়ে ?

বললাম।

আর তারপরেই ওই গম্ভীর স্বচ্ছ চোখে যেন হাসিমাখা কৌতুকের ছোঁয়া।

—আপনার মেয়ে তার মায়ের বাধ্য খুব ?

—কি বলছেন ?

—বলছি, আপনার মেয়ে মায়ের শাসনের আওতায় থাকে ?

এই আলাপও খুব স্বাভাবিক লাগছে না। এমন কি ভদ্রলোকের চোখ বা মুখের দিকে না তাকিয়ে শুনলে অশোভন মনে হতে পারত। বললাম, মেয়ের মা সেই রকমই ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

দু'চোখ বাইরের দিকে ঘুরল আবার। তারপর বিমনা মন্তব্য কানে এলো, বড় ভালো লাগল।

কি বা কাকে ভালো লাগল ভেবে পেলাম না। আমার মেয়ের চেহারার মধ্যে বয়েসজনিত চটক আছে একটু। সেই কারণে প্রায় অচেনা কোনো মানুষের উচ্ছ্বাস প্রত্যাশিত নয়। আমি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছি খেয়াল হতে আবার আমার দিকে ফিরে হাসলেন একটু। বললেন, আপনার জন্যে আপনার স্ত্রীর দুশ্চিন্তাটুকু ভালো লাগল।

আমার জন্য ঘরে বসে কেউ একজন ভাববেন এ একটা তৃপ্তির দিক তো বটেই। এটুকু না থাকলে সংসার চিত্রটা নীরস। ভদ্রলোক এটুকু আনন্দ থেকেও বঞ্চিত কিনা বোঝা গেল না। আলাপের আপাত ছেদ টানার মতো করে বললেন, যাক, কোনরকম অসুবিধে বোধ করলেই বলবেন—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যাচ্ছেন কতদূর ?

—আপাতত ম্যাড্রাস, তার পরেও আপনার সঙ্গেই।

বোঝা গেল উনিও আমাদের পর্যটন গোষ্ঠীরই একজন। আমি কোথায় চলেছি সেটা আমার স্ত্রী বা মেয়ের কথা থেকেই বুঝে নিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমার থেকে ঢের বেশি সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। আর বয়েসেও কিছু ছোট। এরই জোরে সাহায্যের আশ্বাস কানে নেবার মতো নয়। সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারটা এক তরফা হবার কোনো কারণই নেই। আমার স্ত্রীই লোকটির চোখে আমাকে নাবালক বানিয়ে রেখে গেছেন।

এতক্ষণে দলের সহাস্যবদন ম্যানেজারের দর্শন পেলাম। পর্যটন সংস্থার কর্মী। এঁরই তত্ত্বাবধানে সত্তর আশীজনের ইউনিটটি দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় চলেছে। বয়েস পঁয়তিরিশের মধ্যে। লম্বা দোহারা চেহারা। বগলে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ। সর্বদাই সুতৎপর হাসি-হাসি মুখ। এর আগে এঁদের কলকাতার অফিসে তিন দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমার এই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা একরকম শেষ মুহূর্তের ব্যাপার। তখন সমস্ত টিকিট ফুল। তাছাড়া ওয়েটিং লিস্টএ দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। বেরুতে সত্যিই পারব এরকম আশা ছিল না। এই অবস্থায় আমার কাগজের আপিসের একজন বিশিষ্ট সহকর্মীর মারফৎ এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আলাপ পরিচয়ের পর ম্যানেজার আন্তরিক আশ্বাস দিয়েছেন, একটা সীট আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন— ড্রপ দু-চারজন শেষ মুহূর্তে করেই থাকে। যে-কোনো একজন জার্নি ক্যানসেল করলে আপনার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

নিজের গরজে এঁকে খানকয়েক বই প্রেজেন্ট করেছিলাম। পরের সাক্ষাতেই উনি সানন্দে ঘোষণা করেছেন, ওঁর স্ত্রী আমার একজন ভক্ত পাঠিকা। আর তারপরেই মনে হয়েছে আমাকে একখানা টিকিট জুটিয়ে দেবার ব্যাপারে ওঁর গরজ আমার থেকে কম নয়। বলতে সংকোচ, গরজ ওদের সংস্থার অনেকেরই দেখেছি। লেখক বা সাংবাদিক পেলে এরা খুশি হয়। প্রকারান্তরে কোনোরকম প্রচারের আশা রাখে হয়তো।

যাত্রার বেশ দিনকতক আগেই খবর এলো আমার টিকিট রেডি। অর্থাৎ ওয়েটিং লিস্টএ আমার নাম এক নম্বরে উঠে গেছল।

এসব কারণেই ম্যানেজারটির সঙ্গে আমার প্রাকযাত্রার হৃদ্যতা। এও এই কম্পার্টমেন্টের মধ্যেই ছিল কোথাও। নইলে চলন্ত গাড়িতে আর আসবে কোথা থেকে। হাসি মুখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, সব ঠিক আছে তো ?…একটু অসুবিধে হলে মানিয়ে নেবেন সার, মাত্র দুটো দিন, এটুকু পথ একটু এলোমেলো হয়ে যায়, মাদ্রাজে পৌঁছনোর পর সবকিছু নিজেদের কম্যাণ্ডে, তখন আর কোনোরকম অসুবিধে না—মাদ্রাজ থেকে ডানলোপিলোর বিছানাও পাবেন।

আমার পাশের সহযাত্রী মন্তব্য করলেন, এই সমাচারগুলো হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার আগে এসে শোনাতে পারলেন না !

উক্তির তাৎপর্য বোধগম্য হবার কথা নয় ম্যানেজারের। হলও না। আগে এসে এ-সমাচার শোনালে যে-মহিলা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন একটু, তিনি এতক্ষণে বাড়িতে। না বুঝেও ম্যানেজার এই ভদ্রলোককেও একটু তোয়াজের সুরে বললেন, ভালই হল…এঁর সঙ্গে আলাপ আছে তো ?

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে সোৎসাহে আমার পরিচয় বিস্তার করে বললেন, ওমুক……মস্ত লেখক…আর ওমুক কাগজের নামী সাংবাদিক। এবারে এই প্রথম আমাদের সঙ্গে বেরুচ্ছেন…আপনি তো আমাদের পুরনো আপনার জন, এঁকে দেখবেন একটু আর বুঝিয়ে শুনিয়ে দেবেন দয়া করে—ওনার মনে ধরলে আমরাও হয়তো এরপর ওঁর লেখার মধ্যে এসে যাব।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল ম্যানেজার, তারপর আমার দিকে ফিরে সহযাত্রীর পরিচয় দিল, ইনি মিস্টার মঙ্গল ঘোষ, এই তৃতীয় দফা আমাদের সঙ্গে সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরছেন।

আবার এসে খবর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ম্যানেজার তার

অন্য যাত্রীর সন্ধানে চলে গেল। মঙ্গল ঘোষ মন্তব্য করলেন, আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম আবার সঙ্কোচও বোধ করছি।

পরিচয়ের ব্যাপারে ম্যানেজারটি একটু বাড়াবাড়িই করে গেছে। সেই কারণে আমি নিজে সঙ্কুচিত। কিন্তু এ-কথার পর চুপ করে থাকাও যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্কোচের কি হল?

—আপনি নামী লেখক শুনলাম, কিন্তু আমার দৌড় শরৎবাবুর দুই-একখানা বই পর্যন্তই, সেও কোন ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। আসলে নিজের দোষেই আমি ওই রসের জগৎ থেকে নির্বাসিত। শরৎবাবুর পরে একসঙ্গে তিনটি লেখকের নামও করতে পারব না।

বলার মধ্যে দম্ভের আভাস থাকলে কানে লাগত। সেরকম মনে হল না। বললাম, আজকের দিনের কাজের মানুষদের অত সময় কোথায়। প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা আমার।—পরপর এই তিনবার আপনি একই দিকে ঘুরছেন, দক্ষিণ ভারত আপনার খুব ভালো লেগেছে বুঝি?

হাসিমাখা চাউনি মুখের ওপর তুলে জবাব দিলেন, ভালো-মন্দ জানি না, গ্রহের ফেরে ঘুরছি।

আমিও হেসেই বললাম, মঙ্গল তো নিজেই বেশ পাওয়ারফুল গ্রহ—ভদ্রলোক সর্বদা ভেড়েফুঁড়ে চলেন, তাঁকে ঘোরাচ্ছে কে!

জবাব দিলেন না। হাসতে লাগলেন। হাসি দেখে মনে হল কথাগুলো ভালো লেগেছে। আলাপ আপাতত আর এগলো না। ভদ্রলোকের দু'চোখ আবার বাইরের অন্ধকারের দিকে ফিরে গেল। একটু বিমনা ভাব লক্ষ্য করলাম। গাড়ি এখন বেশ বেগে ছুটছে। দ্রুত গতির মধ্যে একখানা স্থির ছন্দের মতো লাগছে মানুষটিকে। ট্রেনের ঝাঁকানিতে শরীর অল্প অল্প দুলছে। কোনো দূরের তন্ময়তার মধ্যে আটকে গেছেন যেন।

রাতের খাওয়ার পাট চুকল একসময়। গোটা কয়েক দূর-পাল্লার

স্টেশন পার হয়ে গেছি। রাত ন'টাও নয় তখন, একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে ম্যানেজারের তদারকে আমাদের খাবার এলো। তেমনি নিঃশব্দে পাশাপাশি বসে খেলাম দুজনে। এ-সময়ে আবার আলাপ জমে ওঠার কথা। কিন্তু তখনো দূরের মানুষই মনে হল লোকটাকে। এটা ইচ্ছাকৃত মৌনীভাব কিনা এরকম সংশয় মনে আসতে আমিও চুপচাপ। পর্যটক সংস্থার খাওয়া-দাওয়া বা অন্যান্য ব্যবস্থা কি-রকম শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খুঁচিয়ে আলাপ বাড়াবার বয়েস আমারও গেছে।

এটা স্লীপার কোচ। রাত ন'টার ও-দিকে অন্তত বাইরের লোক একটিও থাকার কথা নয়। কিন্তু তারপরেও কোনো কোনো স্টেশনে কিছু লোক উঠছে নামছে মনে হল। এটা কণ্ডাক্টর গার্ডের কারসাজি। এই বাড়তি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে সে একটু আধটু লোকদেখানি ঝকঝকি করছে অবশ্য। কিন্তু দরজা লক করে দিলে লোক উঠতে পারার কথা নয়। ও-দিকের দুই-একজন আপত্তি করতে কণ্ডাক্টর গার্ড জবাব দিয়েছে, কানুন আর কে মানছে আজকাল, জোর খাটাতে গেলেই গণ্ডগোল।

আমার ধারণা এই গণ্ডগোল পরিহারের ফাঁক দিয়ে লোকটার পকেটও ফেঁপে উঠছে।

সহযাত্রী মঙ্গল ঘোষ কোনো তিনজন আধুনিক লেখকের নাম জানেন না বলেছেন কিন্তু আপাতত তিনি একখানা মোটা বইয়ের মধ্যে তন্ময়। ইংরেজি বই অবশ্য। নাটক নভেল নয়। এক ফাঁকে বইয়ের নামটা দেখে নিয়েছি। 'দি সেলফ'। ভদ্রলোকের সম্ভবত আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল। দেবালয়ে আকীর্ণ দক্ষিণ ভারতে তিন-তিনবার ভ্রমণের এও একটা কারণ হতে পারে।

রাত দশটা নাগাদ শোবার কথা ভাবছি। ভদ্রলোকের হাতের বই বন্ধ হল। এতক্ষণে বেশ জনাকতক বাইরের প্যাসেঞ্জার ঢুকে গেছে। কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি আসন আমাদের। দুদিকের

কিউবিকলএর প্যাসেজে সেইসব যাত্রীরা কেউ বসে গেছে কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আমাদের সামনে অবশ্য কেউ এসে এখনো দাঁড়ায়নি বা বসেনি। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে সর্বত্রই ওরা ছড়িয়ে পড়বে।

বললাম, অরাজক ব্যাপারখানা দেখেছেন?

তিনিও দেখছিলেন। নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, সর্বত্রই এই ব্যাপার, রাজ্য হারাবার সমস্ত গুণ যাদের বর্তমান তারাই চুটিয়ে রাজত্ব করে থাকে। এর আর দোষ কি।

মুখের কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল, কণ্ডাক্টর গার্ডটি লঘু গাম্ভীর্যে যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে এদিকে আসছে। মঙ্গল ঘোষের হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে লোকটা স্মিত মুখে থমকালো একটু।

মঙ্গল ঘোষ আলতো করে জিজ্ঞাসা করলেন, বাণিজ্য ভালোই হচ্ছে বেশ?

এরকম বেখাপ্পা রসিকতার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। আমিও না। কণ্ডাক্টর গার্ড বাঙালী, কিন্তু এই শোনার পর তাঁর মুখ দিয়ে বাংলা কথা বেরুল না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ মিন?

তার পরের দৃশ্য দেখে আর বাক্যালাপ শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। মঙ্গল ঘোষ মোটা বই হাতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথাটা কণ্ডাক্টর গার্ডের মাথা থেকে আধ হাত ছাড়িয়ে গেল। গলা না চড়িয়েই মঙ্গল ঘোষ বললেন, কি বলছি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? এই দুদিকের দশ-দশ বিশ হাতের মধ্যে একটি লোক এলে তাকে আমি কিছু বলব না—কিন্তু তার পরের স্টেশনেই তোমাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে গার্ডের কাছে নিয়ে যাব—নাও আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হোয়াট ডু আই মিন?

কণ্ডাক্টর গার্ড থমকে চেয়ে রইল দুই এক মুহূর্ত। তারপর

আস্তে আস্তে সরে গেল। অপমানের আঘাত থেকেও এই ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা ঢের বেশি যেন।

আমি হাঁ করে মঙ্গল ঘোষের দিকেই চেয়ে আছি। ভদ্রলোকের আবার সেই হাসিমাখা চাউনি। বললেন, দেখছেন কি, এই ভাষাটাই ওরা কিছুটা বোঝে—আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন, আর ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে এলে ও-ই বাধা দেবে দেখবেন।

. আলাপ পরদিনও বেশি এগলো না। লোকটি যে বেশ জোরালো সে ওই কণ্ডাক্টর গার্ডের সঙ্গে দু কথাতেই বোঝা গেছে। অবশ্য পরে যা দেখেছি এঁকে, সে তুলনায় ওটুকু কিছুই নয়। একাধিকবার সেই মূর্তি দেখে আমাদের দলের বাকি পঁচাত্তর জনের প্রমাদ গুণতে হয়েছে। কিন্তু পরের কথা পরে।

সকালের চা আর দুপুরের খাওয়ার সময় যা দু'চার কথা হয়েছে। দুপুরে ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। চোখ মুখ দেখে মনে হল ঘুমোননি। আমি বেশ একপ্রস্থ দিবানিদ্রা সেরে নিয়েছি। পড়ন্ত বিকেলে বই-হাতে উনি নেমে এসেছেন। মাঝে মাঝে পড়তে দেখেছি। আবার বাইরের তন্ময়তাও লক্ষ্য করেছি।

বার কয়েক চোখোচোখি হয়ে গেল। বিমনা দৃষ্টিটা যেন আমার দিকেই। বইয়ে মন বসছে না বোধহয়। এবারে চোখে চোখ মিলতে হাসলেন একটু।

—কি ?

—না, আপনার কথা ভাবছিলাম।···ওইরকম স্ত্রী-কন্যা ফেলে বেরিয়ে পড়লেন লেখার রসদের খোঁজে ?

ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, ওইরকম কি রকম ?

সহজ সুরেই জবাব দিলেন, আপনার স্ত্রীকে আমার খুব ভালো লাগল। মেয়েটিও বেশ···

গত সন্ধ্যায় ভদ্রলোক বলেছিলেন স্ত্রীর দুশ্চিন্তাটুকু ভালো লাগল।

আজ সরাসরি ভালো লাগার কথাই বললেন। আমার স্ত্রী আর যা-ই হোক রূপসী নন। তাছাড়া বয়েসও হয়েছে। এই স্তুতির মধ্যে ভেজাল কিছু থাকা সম্ভব নয়। তবু রসিকতার সুরে বললাম, এ-যাত্রায় দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পর কলকাতায় ফিরে গিয়েও দেখা হবে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে—আপনার মতো সুপুরুষের ভালো লেগেছে শুনলে তিনিও খুশি হবেন।

হাসলেন বটে একটু, কিন্তু দৃষ্টিটা পর্যবেক্ষণরত।—লেখার খোঁজে আপনাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়?

—হয় মাঝে মাঝে।

—যা পান তার সঙ্গে জীবন মেলে?

—কিছু কিছু সম্ভাবনা মেলে। তাছাড়া পরিবেশ মেলে। চরিত্র মেলে। হেসে আরো যোগ দিলাম, ধরুন টানা চার সপ্তাহ দেখার পর আপনার ধরনের কোনো চরিত্র যদি লেখায় আসে—তাঁর হাব-ভাব আচরণও লেখার মধ্যে অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অনেকখানি ইনটিমেট হবে।

কথাগুলো মাথায় নেবার জন্যেই যেন সময় নিলেন একটু। তার পর সাদাসাপটা মন্তব্য করে বসলেন, বাইরেটাই মিলবে, ভিতরটা কল্পনায় ঠাসা বাজে ব্যাপার হবে।

হাতের বই খুলে বসলেন। লোকটাকে এবারে আত্মম্ভরী মনে হল একটু। এ-রকম মন্তব্য শুনে অভ্যস্ত নই। লেখার জগতের সঙ্গে যার সামান্য যোগও নেই তার সঙ্গে তর্ক বৃথা। তবু আলতো বিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাতের ওই বই 'দি সেলফ' খুব বাস্তব মনে হয়?

হেসে জবাব দিলেন, একদম বাজে! এ-পড়তে পড়তে মনে হয় নিজের কাছে নিজে পৌঁছনোর ব্যাপারটা পঞ্চাশ ষাট হাজার মাইল পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবার সামিল।

ভেবেছিলাম বড় কথা কিছু বলবেন, তার বদলে এই শুনে অবাক একটু।—তাহলে এত মন দিয়ে পড়ছেন?

হাসতে লাগলেন।—আসলে অনেকটা দূরই বটে, বুঝলেন। সেই জন্যেই গোঁ ধরে পড়ছি। শিকার হাত ছাড়া হতে দেখলে শিকারী কতদূর ছোটে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—আমিও সেই মন নিয়ে পিছনে ছুটেছি।

খুব বোধগম্য হল না। এবারে একটু বাস্তব আলাপের দিকে এগোবার চেষ্টা আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এই পথে তিনবার বেরুলেন—তিনবারই একা?

মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তাই।

—তাহলে আমি আর এমন কি দোষ করলাম। বয়েস কতো আপনার?

সঠিক না বুঝেই জবাব দিলেন, আটচল্লিশ।

খুব বেশি হলে বিয়াল্লিশ হবে ভেবেছিলাম। আটচল্লিশ শুনে মনে মনে একদফা স্বাস্থ্যের প্রশংসা না করে উপায় নেই। বললাম, তাহলেও আমার থেকে কিছু ছোট—ঘরে কাউকে ফেলে আসার কাজটা আপনি পর পর তিন বছর ধরে করে চলেছেন।

এবারে বুঝলেন। মুখের হাসি আরো প্রশস্ত হল। আর তাতে যথার্থই সুন্দর দেখালো মুখখানা। মাথা নেড়ে বললেন, বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ফেরার কথা চিন্তা করছেন আমার ঘরে এমন কেউ নেই।

অগোচরে কোনো দুর্বল জায়গায় মোচড় দিয়ে ফেললাম ভেবে একটু সঙ্কুচিত আমি। জিজ্ঞেস করলাম, নেই বলতে···?

সংক্ষেপে জবাব সারলেন, নেই বলতে—নেই। বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

আমি আবছা অন্ধকারে লক্ষ্য করছি মানুষটাকে। হাতের কব্জিতে দামী সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, আঙুলের আংটির মস্ত লাল পাথর থেকে টকটকে জেল্লা ঠিকরোচ্ছে, জামায় ঝকঝকে মিনে-করা সোনার বোতাম। দেখলেই বোঝা যায় সুখের ঘরে লালিত শৌখিন পুরুষ। আর সুঠাম সুপুরুষ তো বটেই। পয়সার জোর

থাকলে আর প্রবৃত্তি থাকলে এই গোছের পুরুষই এক ছেড়ে অনায়াসে বহুবল্লভ হতে পারে। অতএব এই 'নেই'এর ব্যাপারটা আমার কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হল।

মন বলছে এই মানুষের একটা অতীত আছে। যে-রকম অতীত সম্পর্কে আমাদের মতো লেখকদের সহজাত কৌতূহল।

দিনের আলোয় দ্রুত টান ধরে আসছিল। গাড়ির ভিতরটা আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আলো জ্বলেনি। ইলেকট্রিকের কিছু একটা গণ্ডগোলের খবর কানে এলো—সামনের কিউবিকলএর প্যাসেঞ্জাররা বলাবলি করছে স্টেশনে পৌঁছনোর আগে আলোর আশা নেই। সামনের স্টেশন আরো সোয়া ঘণ্টার পথ।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কর্মস্থল কোথায়?

কর্মস্থল নেই। পাকাপোক্ত বেকার।

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বেকার। পয়সাঅলা কিছু বিলাসী বেকার আমার দেখা আছে। এঁকে নিছক সেই গোত্রের একজন ভাবতে ইচ্ছা করে না।

—দেশ কোথায়?

—বাঁকুড়া জেলায়।

—থাকেন কলকাতায়?

—থাকাথাকির ঠিক নেই, এই বছর দুই আড়াই ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম। বইটার ওপর আঙুলের টকটক শব্দ করতে লাগলেন।

—তার আগে?

টকটক শব্দ থামল। মুখ তুললেন। অন্ধকার সত্ত্বেও বোঝা গেল হাসিমাখা স্বচ্ছ দুটো চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হল। খুব হালকা করে জবাব দিলেন, তার আগের টানা সাড়ে ন'টা বছর জেলে কেটেছে।

আমি থতমতো খেলাম একপ্রস্থ। ভদ্রলোকের মুখখানা ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দেখার উপায় নেই। তবু মনে হল

ওই মুখে হাসি লেগে আছে, চোখেও। মনে মনে দ্রুত একটু হিসেব করে নিলাম। ভদ্রলোক আড়াই বছর আর সাড়ে ন'বছর—মোট বারো বছরের হিসেব দিলেন। এখন বয়েস আটচল্লিশ। তার মানে ছত্তিরিশ থেকে সাড়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত জেলে পার করেছেন।

দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পোলিটিক্যাল নিশ্চয়ই ?

জবাব দেবার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন যেন। বললেন, না, হোমিসাইডাল।

অন্ধকারে এবারে যথার্থই চমকে উঠলাম আমি। বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পাচ্ছি না। হোমিসাইডাল অর্থাৎ নিজেকে খুনের দায়ের আসামী বলছেন তিনি। আমার বয়েস পঞ্চাশের ওধারে। স্বল্প আলাপে কেউ কৌতুকের পাত্র ভেবে এ-রকম কথা বলবে সেটাও স্বাভাবিক নয়।

বাইরের অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেন শাঁ-শাঁ করে ছুটে চলেছে। ভিতরে আরো বেশি অন্ধকার। এই প্রথম যেন একটা আলোর তাগিদ অনুভব করছি।

আর কোনো কথা সরছে না মুখে, এও নিজের কাছে বিসদৃশ ঠেকছে।

অবশেষে স্টেশন এলো। গাড়ি থামল। বাইরে ছোটাছুটি হাঁকা-হাঁকি। খানিক বাদে ভিতরেও আলো জ্বলল। সঙ্গে সঙ্গে আমার দু'চোখ ভদ্রলোকের মুখের উপর উঠে এলো। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। ও-দিকের সীটএ ঠেস দিয়ে বসে আছেন। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে লোকজনের ব্যস্তসমস্ত আনাগোনা—ফেরিওয়ালাদের ডাকাডাকি। যাত্রীদের চায়ের তৃষ্ণা, খাবারের খোঁজ। কিন্তু আমার মনে হল ভদ্রলোক এ-সব কিছুই দেখছেন না। তাঁর দৃষ্টি যেন বহু দূরে কোথাও নিবদ্ধ। সমাহিত মুখ। সুন্দর মুখ। এই মুখে পাপ খোঁজার চেষ্টাটা নিজের কাছেই

কেমন বিড়ম্বনাদায়ক। খুঁজেছিলাম কিনা জানি না। চোখে পড়েনি।

তবু আমার কেমন মনে হল, ভদ্রলোক রসিকতা করেননি, মিথ্যে বলেননি। কেন মনে হল আমি জানি না।

গাড়ি নড়ল। আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল। গতি বাড়তে থাকল। বাইরেটা আবার অন্ধকারের গহ্বরে। এখন ভিতরে আলো। এই আলোর চেতনায় ফিরে আসতে লোকটির সময় লাগল একটু। আমি মুখের দিকেই চেয়ে আছি। চোখোচোখি হতে ভদ্রলোক হাসলেন একটু।

—ঘাবড়ে গেছেন?

তক্ষুনি জবাব দিলাম, না আপনি এত সহজে বলে ফেলতে পারলেন, আর আমি শুনেই ঘাবড়াব কেন?

চোখে হাসির আভাস লেগে আছে তেমনি।—আপনি জিজ্ঞেস করলেন, আমিও বলে ফেললাম। কি করে পারলাম জানি না। আজ আড়াই বছর ধরে ঘুরছি, এ-রকম কথা কাউকে বলার দরকার হয়নি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—গল্পের খোঁজ করবেন? হাসছেন।

—না। আড়াই বছর ধরে দক্ষিণ ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন অনুতাপে?

ছ'চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন খানিক। মুখের হাসি গাল বেয়ে নামতে থাকল। জবাব দিলেন, লেখকদের কল্পনা বড় মুশকিলের জিনিস দেখছি! না মশাই, আমি কোনো অনুতাপের মধ্যে বাস করছি না। বরং তার উল্টো। একজনের অনুতাপ দেখব বলে বারোটা বছর অপেক্ষা করে আছি।

—এ-ভাবে ঘুরে ঘুরে আড়াই বছর ধরে সেই একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

—না বারো বছরের মেয়াদ ফুরোলে তাঁর দেখা মেলার কথা। ফুরিয়েছে। দেখা যাক—

হাসি-ভরা দু'চোখ আবার বাইরের দিকে প্রসারিত হল। আর কথা বাড়ালাম না। দেখছি তখনো। নিজের মধ্যে একটা বোঝাপড়া চ লেছে।···খুনী মানুষের মুখ এত সুন্দর হয় কি করে? চোখ এত সুন্ র হয় কি করে? হাসি এত সুন্দর হয় কি করে?

না, এই মুখের দিকে চেয়ে আমার মধ্যে বিরূপতার একটা আঁ চড়ও পড়ছে না। উল্টে মন বলছে এবারে শুভ মহূর্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। একটা মানবচিত্র আঁকার সরঞ্জাম হাতে আসবে হয়তো। এলে সেটাও এমনি সুন্দর হবে কি বিপরীত ভয়ংকর হবে মনের তলায় এই মুহূর্তে সে কৌতূহল শুধু।

মাদ্রাজে নেমে ছিয়াত্তর জনের সমস্ত দলটিকে একসঙ্গে পৌঁছলাম। ম্যানেজার ঠাকুর চাকর বেয়ারাদের ধরলে এই সংখ্যা পঁচাশীতে দাঁড়াবে। যাত্রীদের মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি মেয়েছেলে। বিধবার সংখ্যা নামমাত্র। কারণ এটা নিরামিষ তীর্থপর্যটনের দল নয়। যদিও নিরামিষের ব্যবস্থাও আছে।

পরে মাথা গুণে সঠিক হিসেব করতে পেরেছিলাম। একটি ন'দশ বছরের মেয়েকে ধরে রমণীর সংখ্যা মোট উনত্রিশ। বয়েস পঁয়ত্রিশ থেকে ষাটের মধ্যে সতের জন, আর কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে এগারো জন। বাকি একজন ওই ছোট মেয়ে। মহিলারা কেউ স্বামীর সঙ্গে এসেছেন, কেউ বা ছেলের সঙ্গে, কেউ বা ভাইয়ের সঙ্গে। বছর তিরিশ বত্রিশের একটি মেয়ের সঙ্গে কেবল কোনো চলনদার নেই। মোটামুটি সুশ্রী, কিন্তু কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুর দেখলাম না। পরনে চওড়া কালো পেড়ে শাড়ি। হাতে একগাছা করে সরু রুলি, গলায় সরু চেন হার, কানে পাথর বসানো খুব ছোট দুল। বিধবাই ধরে নিয়েছি। অনেক বিধবা এই সাজে থাকে আজকাল। কিন্তু খাবার সময় মেয়েটিকে মাছ মাংস সবই খেতে দেখে খটকা বাঁধল।

ছেলেদের বয়সও মেয়েদের একই অনুপাতে ভাগ করা যায়। তবে বাচ্চা ছেলের সংখ্যা চার পাঁচটি। আর আমারই মতো একলা বেরিয়েছেন এমনও অনেকে আছেন।

ন্যারোগেজ স্টেশনের ওয়ে সাইডের একটা বড় উঠোনের মতো জায়গায় আমাদের টুরিস্ট কোচ দাঁড়িয়ে। সাড়ে তিন বগির গাড়ি। খুব ছোট নয়। মাঝের আধখানা কম্পার্টমেন্ট দুই অংশে ভাগ করা,

একভাগে রান্নার আর স্টোর রাখার ব্যবস্থা। সেখানেই ম্যানেজারের খুপরি আর ঠাকুর চাকরদের থাকার ব্যবস্থা। পরের ছোট অংশটুকু ছ'জনের ফ্যামিলি রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট। ছ'জনের কোনো পার্টি সেটা বুক করতে পারে। ছ'জনের কম হলে যে বার্থ পড়ে থাকবে সেটা অন্য যাত্রীর বরাতে জুটবে।

বিজ্ঞাপনের চটকে যেমন দেখেছিলাম অনেকটা সেইরকম ব্যবস্থা বটে, কেবল চটকটুকু নেই। বগিগুলো ছোট বড়। আমার বার্থ বিশজন যাত্রীর ছোট বগিটাতে। কিন্তু সেই বার্থ-এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষু স্থির। বেঞ্চগুলো সাধারণ ট্রেনের বেঞ্চ থেকে সরু। তার ওপর ডানলোপিলোর চিলতে বিছানো। ঘুমের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করাটা কসরতের ব্যাপার হবে। তাও না হয় হল, কিন্তু এবারে কপালে জুটেছে আপার বার্থ।

এ-রকম হতে পারে ভাবতেও পারিনি। আবার বড় গাড়িতে কলকাতায় ফেরার আগে পর্যন্ত তেইশ চব্বিশটা দিন বাঙ্কের ওই চিলতে বেঞ্চের মধ্যে কাটাব কি করে। ওপরে উঠলে সোজা হয়ে বসার উপায় নেই, মাথা ছাতে ঠেকবে। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় মনে হল, গচ্চা যা গেছে—গেছে, এখন মাদ্রাজ থেকেই কলকাতায় ফেরা ভালো। আরো রাগ হল যখন দেখলাম, আমার নিচের বার্থ-এর অধিকারী একটি তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলে। সুশ্রী আর শৌখিন ছেলেটা খুশি মুখে ডানলোপিলোর ওপর তার শয্যা রচনা করে ফেলেছে। বার্থের নিচে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে।

ম্যানেজারকে ডেকে বললাম, আর কিছু না হোক আমাকে অন্তত নিচের বার্থ একখানা দেওয়া হল না কেন ?

ম্যানেজারের যুক্তি কিছু অসঙ্গত নয়। তার বক্তব্য মহিলাদের সকলকেই নিচের বার্থ দিতে হবে বাকি যা থাকবে তা প্রায়রিটি অনুযায়ী বিলির ব্যবস্থা। আমি শেষ মুহূর্তের যাত্রী। অগ্রিম সমস্ত টাকা পাওয়ার ফলে প্রায় সমস্ত বার্থের বিলি ব্যবস্থা আগেই হয়ে

গেছল। ক্যানসেলেশান না হলে ওই বার্থও আমার পাওয়ার কথা নয়। আমার অসুবিধের কথা মনে হতে ম্যানেজারটি সত্যি সংকুচিত। আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে প্রস্তাব করল, আপনি এ-রকম একজন সাহিত্যিক নিচের ছেলেটাকে বলব? সে যদি ওপরে উঠতে রাজি হয়...

নিষেধ করলাম, দরকার নেই। যেচে বিব্রত বোধ করা ছাড়া আর কোনো ফল হবে ভাবছি না। ওপরের বাঙ্কগুলো যাদের কপালে জুটেছে তাদের বেশির ভাগই বেজার মুখ দেখেছি। নিচের অধিবাসীটি লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলে ওপরের যাত্রীটিকে ততক্ষণই ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে হবে বা শুয়ে থাকতে হবে।

মেজাজটা শুরুতেই খিঁচড়ে গেল। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দু'দিনের একটি পরিচিত মুখের খোঁজে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলাম। মাদ্রাজ স্টেশনে নামার পর থেকেই লোকটির আর দেখা মেলেনি। স্নান টান সেরে সবাই যখন সামনের আঙিনায় জটলা করছে তখনো ভদ্রলোক উধাও।

সামনের ওই বকুল গাছটার নিচে বসে হাসিমুখে জটলা করছে দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সকালে বড় স্টেশনেও দেখেছি এদের। কারণ চোখে পড়ার মতোই চেহারাপত্র সকলের। এখন স্নান টান সেরে পরিছন্ন হয়ে ওখানে বসার পর মনে হচ্ছে যেন গুটিকতক দেব-দেবীর সমাবেশ ঘটেছে ওখানে। সুখের ঘরে রূপের বাসা। যেমন রূপ তেমনি পোশাক আর গয়নাপত্র।

মেয়ে তিনটিই স্বাস্থ্যবতী, দুধে আলতা গায়ের রং। পটে আঁকা মুখশ্রী। ছেলে দুটি পরে শুনেছি সমবয়সী খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো দুই ভাই। কপালে সিঁদুর-টিপ মেয়ে দুটি তাদের দুই বউ। তৃতীয় মেয়েটি এক বউয়ের সহোদরা—মুখের আদল দেখলেই বোঝা যায়। অবিবাহিতা তৃতীয়টির বছর কুড়ি বয়েস হতে পারে। কলকাতার মতো জায়গায় অত রূপ নিয়ে ওই মেয়েও এতদিন পর্যন্ত অক্ষতযৌবনা

অর্থাৎ অবিবাহিতা আছে কি করে এ-চিন্তাও চকিতে মাথায় এসেছিল। পরে, অর্থাৎ দিন কয়েকের আলাপের পর জানা গেছে মেয়েটির ভাবী স্বামী যোগ্যতা অর্জনের আশায় ইংলণ্ডে দিন যাপন করছে। ফিরে এলে বিয়ে হবে। দু'দিন না যেতে ওরা যেচে এসে আলাপ করেছে। দলে একজন সাহিত্যিক আছে ম্যানেজার একে একে সমস্ত যাত্রীর কাছেই হয়তো সে খবর প্রচার করেছে। হয়তো বা দু-পাঁচ জন জানার পর সকলেই জেনে গেছে।

আমার নিচের বার্থের শৌখিন তরুণ যাত্রীটি ওই দলের অদূরে বসে গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছে। তার পরনে চকচকে ট্রাউজার, গায়ে বহু রঙের চটকদার শার্ট।

আঙিনার আর এক ধারের এক নিরিবিলি কোণে রোদ বাঁচিয়ে বসে আছে সেই মেয়েটি—বয়েস যার তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে এবং মোটামুটি সুশ্রী, এখনো পরনে পাটভাঙা চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি—সঙ্গে যার কোনো চলনদার নেই। বেলা এই এগারোটার সময় একজনও বোধহয় গাড়িতে বসে নেই—স্নান টান সেরে সকলেই এই নবদূর্বা বিছানো প্রশস্ত আঙিনায় নেমে এসেছে। অনেকে বসে আছে, অনেকে কাছে দূরে ঘোরাঘুরি করছে। আমার হঠাৎ কেমন মনে হল এই এতবড় দলের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী বিচ্ছিন্ন। আমি আর ওই চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি-পরা মেয়ে। স্নানের পর মেয়েটির মুখখানা বেশ কমনীয় দেখাচ্ছে। এই মেয়েটির বার্থ আমাদের ঘরেই।

আমার বিশ্লেষণটুকু তারও চোখে পড়ল এক সময়। একটু চেয়ে থেকে সেও যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষ দেখল। তারপর আস্তে আস্তে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

ব্যস্তসমস্ত ম্যানেজার এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। ডাকলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, মঙ্গল ঘোষকে দেখছি না?

—কি জানি, কোথাও গেছেন হয়তো। আরো জানান দিল, ও

ভদ্রলোকের কিছু ঠিক নেই, গেল বারে তো পাঁচ পাঁচ দিন আমাদের সঙ্গে থাকলেনই না, তারপর হঠাৎ এসে আবার জয়েন করলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর সীট কোথায় পড়েছে?

হাসিমুখে ম্যানেজার বকুলতলার রূপবান-রূপবতীদের দলটিকে দেখিয়ে দিল। —ওই ওঁদের সঙ্গে, রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টএ।

—সেটা কি করে হল?

জবাব—ওঁরা পাঁচ জন, এতগুলো বাড়তি টাকা গুণে ছ'টা সীট নিতে রাজি হলেন না, তাই এদিকের একজন সেটা পেয়েছেন। মিস্টার ঘোষ পুরনো যাত্রী, তার ওপর অনেক আগে সমস্ত টাকা আগাম দিয়ে টিকিট বুক করে রেখেছিলেন—তিনিই পেলেন।

একেই বলে ভাগ্য। মঙ্গল ঘোষের সীট আমাদের ঘরে পড়ুক এটা বিশেষ করে চেয়েছিলাম। তা তো হলই না, এমন জায়গায় গিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক যেখানে গিয়ে দু'দণ্ড বসাও মুশকিল। ওই ঝকঝকে দলটির তাতে অসুবিধে হওয়াই স্বাভাবিক।

ম্যানেজার চলে গেল। আমার তক্ষুনি মনে হল, ওদের সঙ্গে থাকতে মঙ্গল ঘোষেরই বা কেমন লাগবে?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্যা ভুলে গেলাম।...মঙ্গল ঘোষ বলেছিলেন তিনি কোনো অনুতাপ নিয়ে বসে নেই, বরং তার উল্টো, একজনের অনুতাপ দেখবেন বলেই বারোটা বছর অপেক্ষা করে আছেন।...

সেই একজন কোনো রমণী হবে তাতে কোনো সংশয় নেই। সেই অনুতপ্ত রমণীকে কোথায় পাবেন তিনি? কোথায় দেখবেন? এই পর্যটন দলের মধ্যেই আছে নাকি সে?...বলেছিলেন. বারো বছরের মিয়াদ ফুরোবার পর তার দেখা মেলার কথা। মিয়াদ ফুরিয়ে থাকলে সরাসরি তিনি সেই মেয়ের কাছে না গিয়ে এই দলের সঙ্গে ঘুরছেন কেন? কোথায় দেখা পাবার আশা তাঁর?

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে আবার অদূরের সেই চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ির মেয়ের দিকে তাকালাম। এতবড় দলের মধ্যে একমাত্র নিঃসঙ্গ

যাত্রিণী। না এই মেয়ের মুখেও কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন ঠাওর করা গেল না। বরং বেশ শান্ত কমনীয়। তবু তাকে ঘিরেই আমার মাথার মধ্যে একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠতে লাগল। মঙ্গল ঘোষের বয়েস শুনেছি আটচল্লিশ। এর বড় জোর বত্রিশ হতে পারে। ভদ্রলোক জেলে গেছেন ছত্তিরিশ বছর বয়েসে এর তখন কুড়ি। বেশ ফারাক। কিন্তু অঘটন ঘটতে না পারার মতো বড় কিছু নয়। বিশেষ করে মঙ্গল ঘোষের যে-রকম চেহারা। নিজের মুখে না বললে কে তার বয়েস বুঝবে?

বিব্রতবোধ করলাম একটু। মেয়েটি আবার এদিকে ফিরেছে, আমি চেয়ে আছি দেখে আবার আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল।

যথাসময়ে খাওয়ার ডাক পড়েছে। নিচের বার্থের ডানলোপিলো সরিয়ে যার যার ঘরের বেঞ্চিতে খাবার দেওয়া হয়। খেতে খেতে ওই মেয়েটির দিকে আপনি চোখ গেছে, নিরামিষ নয় আমাদের মতোই ডাল ভাত মাছ মাংস খাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহল আরো বাড়ল।

মাদ্রাজে দু'দিনের অবস্থান। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে এই গাড়ি সচল হবে। বিকেল চারটেয় মাদ্রাজের ভ্রমণসূচী শুরু। কিন্তু তখনো মঙ্গল ঘোষের দেখা নেই। ভদ্রলোক খেতেও আসেননি শুনলাম।

সমস্ত দিন ঘোরাঘুরির পরেও রাতে ওই সরু বাঙ্কে শুয়ে ভালো ঘুম হল না। পর দিন সকাল থেকেই বেড়ানোর প্রোগ্রাম আবার। সমস্ত শহরের যাবতীয় কিছু দেখার পক্ষে দুটো দিন খুব যথেষ্ট নয়। দুপুরের ঘণ্টা কতক বাদ দিয়ে এই দিনটাও ত্বরিত ঘোরাঘুরির মধ্যে কেটে গেল। এরই মধ্যে যাত্রীদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় বাড়ছে। এ-সব যাত্রায় সম্ভবত আপনা থেকেই এক-আধজন লিডার দাঁড়িয়ে যায়। এখানেও একজন সুতৎপর দিলদরিয়া ভদ্রলোক সেই ভূমিকা নিলেন। বেঁটে খাটো চটপটে ছটফটে মানুষ, হাঁক-ডাক করে কথা বলেন, হা-হা শব্দে হাসেন। নাম দ্বিজেন মল্লিক। বয়েস ষাটের নিচে।

দু'দিনের মধ্যেই সকলের দ্বিজুদা হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ আর নাতি নিয়ে প্রায় বছরই একদিকে না একদিকে বেরিয়ে পড়েন শুনলাম। এবারেও তাই বেরিয়েছেন। সঙ্গে মস্ত ওষুধের বাসকেট আর পানের বাক্স এসেছে তাঁর। এরই মধ্যে কাউকে মাথা ধরা কাউকে বা হজমের ওষুধ দিয়েছেন। সেধে সেধে পান খাওয়াচ্ছেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য হাসি মুখেই চাকর বাকরদের হম্বি-তম্বি করে নির্দেশ দিতে শুরু করেছেন। আউটিংএ বেরুনোর উনিশখানা ট্যাক্সির মধ্যে দল অনুযায়ী ব্যাচ ভাগ করে দিয়েছেন, মোট খরচের সমান এক এক অংশ প্রত্যেকের দেয়—ম্যানেজারের সঙ্গে বসে কড়াক্রান্তি সেই হিসেবও তিনিই করেছেন। এ-হেন রসিক মানুষের নেতৃত্ব মেনে নিতে কারো আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছেলে ছেলের বউও এই কারণে পরিতুষ্ট মনে হল।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় পরিচিতের মতো নিজে থেকেই এসে আমাকে বলেছেন, আপনি এমন চুপচাপ কেন, বাড়ির জন্যে মন খারাপ নাকি?

কোনো সুরাহার আশা নেই, তবু বললাম, আজ্ঞে না, সীটটা ঠিক পছন্দ হয়নি।

—তাই নাকি! সীট তো সবই উনিশ বিশ এক রকম, চলুন তো দেখি—

সাগ্রহেই আমাদের ঘরে এলেন। আমার বাঙ্ক দেখে বললেন, খাসা তো। আপনার অসুবিধে কি?

—ওটুকু সরু জায়গার মধ্যে মাথা গোঁজ করে এতক্ষণ থাকা··· রাতেও ভালো ঘুম হয়নি—

—মাথা গোঁজ করে থাকতে যাবেন কেন, ওপরে যখন থাকবেন শুয়ে থাকবেন, অন্য সময় নেমে আসবেন—গাড়িসুদ্ধ লোকের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেবেন। রাতে ঘুম না হলে আমাকে বলবেন ব্যবস্থা করে দেব। কিচ্ছু ভাববেন না, সব আমরা এক পরিবার এখন, অসুবিধের কথা মনে হলেই সেটা তুচ্ছ ভাববেন—নিন্ পান খান।

কামরায় এদিক ওদিকে পাঁচ সাত জন বসে। ওদিকের কোণে সেই মেয়েটিও আছে। এদের সামনে নিজের অসুবিধেটা ব্যক্ত হয়ে পড়তে লজ্জা পেলাম একটু।

কিন্তু অনভ্যস্ততার দরুন এই ব্যবস্থার মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে সত্যিই অসুবিধে হচ্ছিল। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি আর দু'চার দিনে ঠিক সয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরের দিনের মধ্যে যাত্রার উৎসাহ আমার কমেই আসছে। রাত ন'টার পর মাদ্রাজ ছাড়ব আমরা। কিন্তু বিকেল চারটে পর্যন্তও স্থির করে উঠতে পারছিলাম না এখান থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের দিকে পাড়ি দেব কিনা। মনে মনে এই চিন্তাটার সঙ্গেও যুঝছি আমি। কারণ, এক গাদা টাকাই শুধু লোকসান নয়, ব্যাপারটা স্ত্রী আর মেয়ের কাছে হাসির খোরাক আর চিরদিনের গল্পের খোরাক হয়ে থাকবে। আরো একটা কথা, আমার ভিতরের সেই ভবঘুরে মানুষটার এই চরিত্রবদলও ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না।

বিকেল তখন সাড় চারটে। এ-বেলা আর প্রোগ্রাম করে বেরুনো নেই। রাতে গাড়ি ছাড়বে। যে-যার ইচ্ছেমত কাছাকাছি বেরুতে পারে। নিচের বার্থএ বসেছিলাম। সবে চা-পর্ব শেষ হয়েছে। এবারে নামব ভাবছি। বার্থের মালিক তরুণ ছেলেটা পাশের জানালার ধারে বসে। ঘাড় ফিরিয়ে কোণাকুণি এক একবার কালো চওড়া-পেড়ে শাড়ি-পরা মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে। এ-কামরায় এক সে ছাড়া আর অল্প-বয়সী মেয়ে নেই। অন্য কামরার সমবয়সী মেয়ে বউদের সঙ্গে ছেলেটার একটু ভাব-সাব হয়েছে লক্ষ্য করেছি।

কামরায় ঢুকলেন যে-মানুষটা তাঁর আশা বোধহয় ছেড়েই দিয়েছিলাম। মঙ্গল ঘোষ। মাদ্রাজে নামার পর এই প্রথম দেখলাম তাঁকে। সেই হাসিমাখা মুখ, হাসি ছোঁয়া চাউনি। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাবনা-চিন্তা তলিয়ে গেল। মনে হল এতক্ষণে আত্মজনের দেখা পেলাম।

কাছে আসতে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'দিন কোথায় ডুব মেরেছিলেন?

—রাতটুকু হোটেলে আর সমস্ত দিন যত্রতত্র। আমার এই ছকে বাঁধা বেড়ানো ভালো লাগে না।

পাশে বসলেন। সামনের ছেলেটা আর একটু ও-ধারে সরে গেল। কামরার অন্য দু'পাঁচ জনও একবার ঘাড় ফিরিয়ে নবাগতকে দেখে নিল। সেই মেয়েটিও। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোযোগ এই দু'দিকে তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে উঠল।

পাশে বশেই মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠি লিখেছেন?

খেয়াল না করে ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

—কোথায় আবার, বাড়িতে?

আমি অপ্রস্তুত একটু।—এখনো লেখা হয়নি।

—কেন লেখা হয়নি? ভাবানোটা আপনার প্রিভিলেজ? পোস্টকার্ড আছে সঙ্গে?

—সুটকেসে আছে।

—উঠুন। লিখুন।

সেই মেয়েটি এখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই লোক তাকে এই কামরায় দেখেছে কিনা তাও জানি না। সামনের ছেলেটা এবারে উঠে গিয়ে নেমে গাড়ির পাশে দাঁড়াল। হেসেই মঙ্গল ঘোষের দিকে তাকালাম আমি। বুকের তলায় এত দরদ যার সে খুনের আসামী মনে হতেই বেখাপ্পা লাগছে। বললাম, এখান থেকেই সরে পড়ব কিনা ভেবে না পেয়ে লেখা হয়ে ওঠেনি। ওপরের বাঙ্কটা দেখালাম, ওই দেখুন আমার জায়গা, বসলে ছাতে মাথা ঠেকে, দু'রাত ভালো ঘুম হয়নি······তার ওপর আপনার দেখা না পেয়ে ভাবছিলাম ফিরেই যাই।

মঙ্গল ঘোষ অবাক একটু। উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের বাঙ্কটা একদফা ভালো করে দেখে নিলেন। আবার বসে বললেন, আপনার

স্ত্রী আপনাকে ঠিকই চিনেছেন। বেরুনো ঠিক হয়নি। নিচের এই বার্থটা কার?

জানালা দিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়ানো শৌখিন ছেলেটাকে দেখিয়ে দিলাম। ওই যে, এখানে বসে ছিল…

আর কথা না বলে জানালায় মাথা গলিয়ে ছেলেটাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন ভদ্রলোক। দেখছেন তো দেখছেনই। এত কি দেখছেন ভেবে পেলাম না। উঠে সোজা উঠোনে নেমে গিয়েও এক দফা দেখে নিলেন। তারপর আবার কামরায় এসে পাশে বসলেন। বললেন, কালকের দিনটা অপেক্ষা করুন, আশা করছি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, না না আপনি ওকে কিছু বলতে যাবেন না—

আমি কাউকে কিছু বলব না, আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন না একটু।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন এবং আর কিছু বলার আগেই নেমে চলে গেলেন।

এই লোকের মতি বোঝা ভার। কি করবেন ভেবে না পেয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। মনে মনে ভাবলাম ভদ্রলোকের সীটটাও যদি এ-ঘরে পড়ত। তাহলে অনেকখানি ভালো লাগত সন্দেহ নেই। আমাদের স্বয়ংবৃত লিডার দ্বিজেন মল্লিককে বলে এখন আউটিংগুলো শুধু এঁর সঙ্গে কাটানো যেতে পারে।

ওদিকের কোণের মেয়েটির দিকে তাকালাম। এবারে সেও কামরা থেকে নামছে। ভিতরটা আবার সন্ধিৎসু হয়ে উঠল আমার।

মঙ্গল ঘোষ আমাকে পরের দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন: তাঁর মতলব আমি ঠাওর করতে পারিনি। কিন্তু পরের চার ঘণ্টার মধ্যেই সমস্যার নাটকীয় সমাধান হয়ে গেল। সমাধান যেচে এলো।

রাত ন'টার পরে গাড়ি ছাড়ার কথা। আটটায় মঙ্গল ঘোষ আবার আমাদের কামরায় ঢুকে গম্ভীর মুখে আমার আর নিচের বার্থের ছেলেটার মাঝখানে বসলেন। বিরক্তির সুরে বললেন, ম্যানেজারকে খোঁজাখুঁজি করছি,কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল লোকটা।

—কেন? আমি না বুঝেই জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন আবার কি, আমার সীট দিয়েছে ওই রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টের পাঁচ পাঁচটা অল্প বয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে—না পারে ওরা সহজ হতে, না পারি আমি। ছেলেমেয়েগুলো ভারী সুন্দর, আর সেই রকম ফুর্তিরও মেজাজ ওদের—কতরকমের হাসি গল্প মসকরার মধ্যে থেমে যেতে হচ্ছে—যেটুকু শুনছি তাতেই আমার কান মুখ লাল—এভাবে বাইশ চব্বিশ দিন একসঙ্গে থাকা পোষাতে পারে? ওদের একজন আবার জিজ্ঞাসা করল দাদার বয়েস কতো। কম ভেবেছিল বোধহয়, পঞ্চান্ন শুনে তো নাজেহাল অবস্থা।

নাজেহাল অবস্থা আমারও, মাদ্রাজের গাড়িতে ভদ্রলোক নিজের মুখে বলেছেন তাঁর বয়েস আটচল্লিশ—দু'দিনের মধ্যে পঞ্চান্নয় গড়িয়ে গেল! আমার বিস্মিত মুখের ওপর পলকের ইশারার ঝাপটা পড়ল একটা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখি সে সাগ্রহে শুনছে। এমনিতেও না শোনার কারণ নেই, ভদ্রলোক একটু গলা তুলেই বিরক্তি জ্ঞাপন করছিলেন।

মঙ্গল ঘোষ আবার বললেন, এখন ম্যানেজারকে ধরে ওই ঘর না বদলে উপায় কি বলুন, তা না হলে এখান থেকেই ফিরে যেতে হয় আমাকে। থমকালেন একটু, আপনি তো এখানে একটা আপার বার্থএ পড়ে আছেন, সেখানে আমার লোয়ার বার্থ—সামনেই আবার ওই তিনটি সুন্দরী মেয়ের মধ্যে অবিবাহিত মেয়েটি—সীট বদলাবদলি করবেন আমার সঙ্গে? আপনি লেখক মানুষ, আপনার ভালো লাগতেও পারে--মেয়েটাকে নিয়ে ভগ্নিপতি আর তার ভাইয়ে সে-যা ঠাট্টা তামাসা না!

যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি। পাশের ছেলেটার মুখখানা দেখার মতো এখন। সে-যেন ভারী একটা প্রত্যাশার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, বয়েসটা আমার আপনার থেকেও বেশি—অতটা বরদাস্ত হবে না।

—আবার যাই তাহলে ম্যানেজারের খোঁজে, এই রাতের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা না হলে আমি সরেই পড়ব। চোখে মুখে বিরক্তি মাখিয়ে আবার প্রস্থান করলেন।

ঠিক তক্ষুনি ওই ছেলেটো আমার কাছে সরে এলো। সময় নষ্ট করার সময় নেই যেন। জিজ্ঞাসা করল, ব্যবস্থা না হলে ভদ্রলোক কি সত্যি ফিরে যাবেন নাকি?

বললাম, যেতে পারেন, ওই রকমই মানুষ।

—তাহলে আপনি ডাকুন ওঁকে, ম্যানেজারকে বলার কিছু দরকার নেই,—আমি বদলা-বদলি করতে রাজি আছি।

যথাসময়ে গাড়ি সচল হয়েছে।

এই রাতে অবশ্য খুব বেশি দূরে যাবে না। চিঙ্গেলপুট-এ গিয়ে বিশ্রাম। সকালে সেখান থেকে অনেক দেখার জায়গায় যাওয়ার আছে—শ্বেত-পক্ষীরূপী হরপার্বতীর পক্ষীতীর্থ, মহাবলীপুরম—সেখানে বলীরাজার পাতালপুরী, বামনভিক্ষা, বরাহ অবতার, ধর্মরাজ সিংহাসন, আরো কত কি। কিন্তু সব ভুলে আপাতত আমি মঙ্গল ঘোষের হাসি মুখখানাই ভালো করে দেখছি। আপত্তি সত্ত্বেও আমার বিছানা টান মেরে তিনি নিচে নামিয়ে এনেছেন, নিজের বিছানা ওপরে পেতেছেন। আর তারপরেই বলেছেন, বসে ঠাণ্ডা মাথায় এবারে আপনার স্ত্রী বা মেয়েকে চিঠিখানা লিখে ফেলুন তো।

চলন্ত গাড়িতে লিখতে অসুবিধে। কথা দিয়েছি কাল ভোরেই লিখব। জিজ্ঞাসা করেছি, আমার অসুবিধের কথা শুনেই আপনি

কি করে বুঝেছিলেন ও-ছেলে টোপ গিলবে—কি করেই বা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ?

হাসতে লাগলেন।—এই এক ব্যাপারে আমি স্পেশালাইজ করেছি বলতে পারেন। আপনাকে আশ্বাস দেবার আগে ছেলেটাকে ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। মেয়েমানুষের দিকে কোন পুরুষ কতখানি ঝুঁকতে পারে না পারে সেটা আমি চোখ মুখ দেখলে আঁচ করতে পারি—আচরণ দেখলে তো পারিই—সর্বাঙ্গে নামাবলী এঁটে বসে থাকলেও পারি। এই নাবালক ছেলেটা তো কোপ খাবার জন্যে গলা বাড়িয়েই আছে। নেমে গিয়ে খানিকক্ষণ ওয়াচ করার পর আর আমার কোনো ভাবনাই ছিল না—ও ওই দলটার পিছনেই ঘুর-ঘুর করছিল।

অস্বীকার করব না, এই একটা ঘণ্টার মধ্যে যাত্রার রংটাই যেন পালটে গেছে আমার কাছে। কথা না বলে লোকটি পাশে বসে থাকলেও যেন এক ধরনের জীবনের তাপ অনুভব করা যায়। কিন্তু আমার আরো কিছু জানতে বুঝতে বাকি। কামরার উল্টো দিকের শেষ মাথার চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে চোখ যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। এখানে এই লোকের অবস্থানের দরুন চোখে পড়ার মতো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখছি না। পাশের প্রৌঢ় দম্পতীব সঙ্গে কথাবার্তা কইছে মেয়েটি। পাশাপাশি সীট, সেই কারণে একমাত্র ওঁদের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখিনি এ পর্যন্ত।

এ কামরায় এসে মঙ্গল ঘোষ সকলকেই পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিয়েছেন এক প্রস্থ। ওই মেয়েটিও বাদ পড়েনি। আর তারপরেও এ পর্যন্ত বার কয়েক লক্ষ্য করেছেন তাকে। আমি ভিতরে ভিতরে সজাগ হয়ে উঠেছি।

হঠাৎ এক ফাঁকে বলে বসলাম, ওই মেয়েটি একা বেরিয়ে পড়েছে …চেনেন ?

একটু অবাক হয়েই বললেন, একা এ-সব দলে অনেকেই বেরোয় —আমি চিনবো কি করে ?

না, যা দেখব আশা করেছিলাম, দেখলাম না। ভদ্রলোক চেয়ে আছেন আমার দিকে। আমিও তাঁর দিকে।

হেসে ফেললাম।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলেন। হেসেই বললেন, এখানে আপনার কাছে এসে ভালো করিনি দেখছি—একা চলেছে বলেই আমার সঙ্গে যোগ আছে ধরে নিলেন!

কৈফিয়তের সুরে জবাব দিলাম, আমার মন বলছে ওই মেয়েটিরও কিছু একটা অতীত আছে।

—সে-তো কম-বেশি অনেকেরই আছে, আপনি কি এরপর এখানকার সকলের অতীত হাতড়ে বেড়াবেন নাকি ?

হেসে জবাব দিলাম, সকলের কেন!

মেয়েটিকে এবারে একটু ভালো করেই নিরীক্ষণ করতে লাগলেন মঙ্গল ঘোষ। তারপর প্রস্তাব করলেন, ডেকে আনব এখানে ?

আমি প্রমাদ গনলাম।—না-না, সে-কি!

উনি বললেন, এক গাড়িতে একসঙ্গে যাচ্ছি, দোষের কি আছে। আচ্ছা সবুর করুন দুই একদিন, আলাপ হয়ে যাবেই।

সত্যিই দুদিনের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল। মঙ্গল ঘোষই ডেকে এনেছেন অবশ্য। আরো বিশ পঁচিশজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার মতো হাসিমুখে কথা-বার্তা বলেছে।

এবারে নিজের প্রসঙ্গ বলেই লিখতে সঙ্কোচ, তবু এর ফলে মঙ্গল ঘোষের আর একটু বাড়তি মনোযোগ লাভ করা গেছে বলেই লেখা। ম্যানেজারের প্রচারের কল্যাণেই একে একে অনেক সহযাত্রী পরের দু'দিনের মধ্যেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেছে। প্রথমেই এসেছে সেই রিজার্ভ কামরার ব্যাচ—তিন রূপসী আর তাদের পিছনে এখানকার সেই তরুণটি, মঙ্গল ঘোষ যাকে ঠেলে পাঠিয়েছেন।

ওই পাঁচ তরুণ-তরুণী কলকাতার কোনো বিখ্যাত দত্ত বাড়ির ছেলে ছেলের বউ বোঝা গেল। লেখার প্রসঙ্গে মেয়েরাই বিশেষ করে মনোরঞ্জনের কথা বেশি জানালেন আমাকে। মঙ্গল ঘোষ সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছেন তাদের—আমাকেও। আমি সহাস্যে তাদের বলেছি এ-রকম সুন্দরী মেয়েরাও আমার বই পড়েন জানা ছিল না।

ছেলে দুটোর একজন বলল, খুব জানা ছিল—আমরা জ্বালাতন করব জেনেই কাউকে না জানিয়ে আপনি বেড়ানোটা সেরে ফেলার মতলবে ছিলেন—ভাগ্যিস ম্যানেজার হঠাৎ বলে ফেলল।

পরের দফায় এসেছেন সপরিবারে এবং সঙ্গে আরো জনাকতক সাহিত্যরসিক-রসিকা জুটিয়ে নিয়ে লিডার দ্বিজু মল্লিক। অভিযোগের সুরে বলেছেন, আপনি এ-রকম একজন গুণী মানুষ সঙ্গে এসেছেন আর আমরা কিনা জানতেই পারিনি—আমার এই গিন্নি আর বউমা তো আপনার বই পেলে, ইত্যাদি।

গিন্নির সরস মুখ আর বউমার সলজ্জ মুখ দেখলাম। অন্যরাও এক-একটা বই প্রসঙ্গে পাঁচ রকমের প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। মঙ্গল ঘোষের তখনো কৌতুক-মাখা নির্বাক দ্রষ্টার ভূমিকা।

নিজের কামরার মধ্যেও কদর বাড়ল বেশ বললে অত্যুক্তি হবে না। ও-ধারের কোণের মেয়েটি তখনো আলাপ করতে আসেনি বটে, কিন্তু তারও প্রসন্ন চাউনি লক্ষ্য করেছি।

পরে মঙ্গল ঘোষ মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে এত লেখকভক্ত আছে আমার তো জানা ছিল না।

জবাব দিয়েছি, সকলে আপনার মতো হলে আমাদের তো না খেয়ে মরতে হত।

হেসে সায় দিলেন, তা ঠিক কিন্তু মেয়েরাই আপনার বেশি ভক্ত মনে হল। হঠাৎ কোণের মেয়েটির দিকে চোখ গেল তাঁর। বললেন, ওই মেয়েটি নিশ্চয় আমার দলে—আপনার কোনো বই পড়েনি।

তেমনি হেসে জবাব দিলাম, নিশ্চয় পড়েছে।

এই দুদিনে আলাপ না হলেও একই কামরায় অবস্থানের হেতু দেখাশুনার অভ্যস্ততায় মনোভাব সহজ হয়েছে। মহাবলীপুরমএ মঙ্গল ঘোষ কামরার সকলকে যখন ডাব কিনে খাইয়েছেন তখন তার হাতেও একটা তুলে দিয়েছেন। ওই মেয়েও সলজ্জ হেসে সেটা নিয়েছে।

পাশের দম্পতি ভিন্ন আর কারো সঙ্গে মেয়েটির বাক্যালাপ দেখিনি বড়। কেবল লিডার দ্বিজু মল্লিক কর্তব্যের দায়ে যেচে এসে তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছেন। একলা বেরিয়েছে মহিলা, সুবিধে অসুবিধের খবর রাখা কর্তব্য। মোটরে ব্যাচ ভাগ করার সময় মেয়েটি ওই প্রৌঢ় দম্পতির সঙ্গ নিয়েছে। কিন্তু চারজনের ব্যাচে আর একজন কে যাবে? দ্বিজু মল্লিক নিজেকেই তুলেছেন সে গাড়িতে। তাঁদের পরিবারের পাঁচজনের একজন বাড়তি—সমস্যার সমাধান।

তাঁকে ভালো করে লক্ষ্য করে মঙ্গল ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে কিন্তু এখনো তিনি নখদন্ত শূন্য নির্দোষ গোছের রমণী প্রেমিক—আপনাকে বলে দিলাম।

এও তা বলে মেয়েকাতুরে পুরুষ চেনার নজির ভাবিনি।

আমার কথাটা চ্যালেঞ্জের মতো নিলেন মঙ্গল ঘোষ। উঠে সোজা ওই মেয়েটির কাছে চলে গেলেন। বিড়ম্বনার একশেষ আমার। মঙ্গল ঘোষ কি বলছেন তাঁকে এখান থেকে বুঝতে পারছি না। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে হাসছে সেটুকু স্পষ্ট। ওখান থেকেই একবার তাকালো আমার দিকে। তারপর মঙ্গল ঘোষের কিছু একটা অনুরোধ এড়াতে না পেরেই যে[illegible] সলজ্জ হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। এদিকে আসছে[illegible]

—বসুন বসুন, [illegible]

বসালেন। তা[illegible]

নিলেন এক [illegible]

খুবই বিব্রত বোধ করছি। —কেন বলুন তো?

—আগে জবাবটা দিন না।

মেয়েটি হাসছে অল্প অল্প। বললাম, গোটা সত্তর হতে পারে—

খুশির ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন একটু।—হাওড়া স্টেশনে আপনার স্ত্রীকে দেখে মনে হয়েছিল নিতান্ত একটি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নাবালককে হাতছাড়া করছেন তিনি। মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, এঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইনি বললেন, সব পড়েছেন কিনা জানেন না, তবে ষাট বাষট্টিখানা অন্তত পড়েছেন। বাট হাউ আর ইউ সো সীওর অ্যাবাউট ইওর রিডার্স?

বললাম, আর লজ্জা দেবেন না, থামুন এবার।

মেয়েটির দিকে ফিরলেন মঙ্গল ঘোষ। —আমি এঁর একটা লেখাও পড়িনি, কিন্তু এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি ওঁর লেখা এত পড়েন কেন, কি পান?

আমি অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু মেয়েটির জবাব কানে লেগে থাকার মতো। একটু ভেবে বলল, এঁর কোনো লেখার মধ্যে অন্ধকার বা হতাশা শেষ কথা নয়···মানুষকে উনি ভালোবাসেন।

মঙ্গল ঘোষের পর্যবেক্ষণরত দুই চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল একটু।

আলাপ চলতে লাগল। মেয়েটির নাম স্মৃতিকণা। স্মৃতিকণা চক্রবর্তী। কলকাতায় ছোট মেয়েদের একটা গানের স্কুলের টিচার। বাবা-মা নেই, কিন্তু আত্মীয় পরিজন আছে। তাদের সঙ্গে থাকে না। ওয়ারকিং গার্লস হোস্টেলে একটা ঘর নিয়ে থাকে। আগেও এদিকে এসেছিল, ছ'সাত বছর ··· ·তবে সেটা এ-রকম দলের সঙ্গে নয় ঠিক।

'লন?

' এসেছিলেন?

মেয়েটির চোখে মুখে যেন একটা পলকের অস্বস্তি দেখলাম আমি। ঠাণ্ডা গলায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, না···।

এর বেশি আর বলার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। প্রসঙ্গের যবনিকা টানলাম তাড়াতাড়ি। বললাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল, এরপর গান শোনাবেন তো?

মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল। বলল, শোনাব, কিন্তু সামান্যই একটু আধটু জানি।···আমি বয়েসে অনেক ছোট, আমাকে আপনি করে বলবেন না।

স্মৃতিকণা নিজের সীটে চলে যাবার পরে মঙ্গল ঘোষকে হঠাৎ যেন বিমনা দেখলাম খানিকক্ষণ পর্যন্ত। এই ভাবটা আমি মাদ্রাজের গাড়িতেও দেখেছি। কাছে বসে থেকেও হঠাৎ যেন বেশ দূরে চলে যেতে পারেন ভদ্রলোক।

তখনো আত্মস্থ ঠিক নন, জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ওই স্মৃতিকণাকে বেশ সীরিয়াস মেয়ে মনে হয়—না?

—এখন অন্তত তাই মনে হয়।

···আপনার লেখা বই তাহলে সীরিয়াস মেয়েরাও পড়ে?

প্রশ্ন শুনে আমি হতবাক খানিক, কিন্তু কিছু একটা ভাবছেন মানুষটা তাতে কোনো ভুল নেই। হেসেই জবাব দিলাম, কি করে বলব। একটু লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, আপনি যেন অন্য কোনো একটি সীরিয়াস মেয়ের কথা ভাবছেন?

. এবারে আত্মস্থ হলেন যেন। সজাগ দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর এঁটে বসল। চোখের কালো তারায় শুধু সামান্য হাসির ছোঁয়া একটু। বললেন, আমি মশাই সত্যিই লোক ভালো নই-–আমাকে বেশি ঘাঁটাবেন টাঁটাবেন না।

আমার মনে হল, কথাগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের অগোচরের কিছু যেন ক্ষোভ উন্মোচন করলেন তিনি।

শুরুতে নির্ধারিত সূচী থেকে কি কারণে আমরা একদিন পিছিয়ে পড়েছিলাম সঠিক মনে নেই। হয়তো বা টুরিস্ট কোচ টেনে নিয়ে যাবার কনেকটিং ট্রেনএর কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল। চিঙ্গেলপুট থেকে মহাবলীপুরমের সফর একদিনে শেষ হয় নি। সেখান থেকে পরদিন আবার চিঙ্গেলপুটএ ফিরে একটা দিনের জন্যে আটকে গেছি। হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যেই কেটেছে দিনটা। মঙ্গল ঘোষ সানন্দে একধার থেকে ফোটো তুলে গেছেন সকলের। এই জিনিসটি অর্থাৎ একটা দামী ক্যামেরা তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী। রাতে স্মৃতিকণার গান শুনেছি। গান শুরু হতে মঙ্গল ঘোষ কামরার আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন। খালি গলায় এ গানে বাড়তি আতিশয্য কিছু নেই। কায়দাকানুন বর্জিত সহজ স্বতোৎসারিত গলার মিষ্টি গান। মনে হয়েছে একটি মেয়ে যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে নানাভাবে অদৃশ্য কোনো দেবতার পায়ে নিবেদন করে দিতে চাইছে।

গান শেষ হতে মঙ্গল ঘোষ চুপি চুপি বলেছেন, মেয়েটার অতীত আছে বলেই তো মনে হয় মশাই। আপনি লেগে থাকুন

তাঁকেই জব্দ করার ইচ্ছে আমার। ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মেয়েছেলে বলেই ঘাঁটাবার সাহস দিচ্ছেন ?

পরদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে এখানকার লোকাল গাড়ি চেপে আমরা রওনা হয়েছি কাঞ্চিপুরম। কেউ কেউ বলেন কাঞ্জীভরম। তখনো মনে কারো আনন্দের ঘাটতি নেই এতটুকু। সামনেই এতবড় এক বিপাক হাঁ করে আছে এ কারো কল্পনার মধ্যে নেই।

মেয়ে-পুরুষ ছিয়াত্তর জনের এই গোটা দলটাকেই ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন মঙ্গল ঘোষ।

অথচ গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত একটু বাড়তি হাসিখুশির মধ্যে ছিলেন ভদ্রলোক। এই বাড়তি খুশির কারণ স্মৃতিকণা। লোকাল ট্রেনে এক একটা ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ হয়ে গেছলাম আমরা। স্মৃতিকণাকে লিডার দ্বিজু মল্লিক তাঁদের কামরায় উঠিয়ে ছিলেন। গত সন্ধ্যায় তার গানের প্রশংসা শুনে সেই দিনে দুপুরেই তাকে দু-তিন খানা গান গাইয়ে ছেড়েছেন।

স্টেশানে নেমে লিডার ম্যানেজারের সঙ্গে গেছেন টাঙ্গা ঠিক করতে। চারজন করে কুড়িখানা টাঙ্গা লাগবে। ম্যানেজারের সঙ্গে দু-তিনজন লোক আছে আমাদের চা-টা জোগাবার জন্য। টাঙ্গা-ওয়ালাদের সঙ্গে ঝকাঝকি করে দর দস্তুর ঠিক করা ম্যানেজার আর দ্বিজু মল্লিকেরই কাজ।

স্মৃতিকণা সেই ফাঁকে আমার কাছে এসে চুপি চুপি বলল, অসুবিধে না হলে আমাকে এবার থেকে আপনাদের সঙ্গে নেবেন—

অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটা আমার কাছে অন্তত সহজ হয়ে উঠেছিল।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলো তো?

মেয়েটা ফর্সা নয়, তবু একটু লালের আভাস দেখলাম যেন মুখে। ঝপ করে বলেই ফেলল, ভালো লাগে না, উনি এত বেশি আপনার জনের মতো ব্যবহার করেন—

উনি বলতে নিশ্চয় দ্বিজেন মল্লিক। দুজনেই ও-দিক ফিরেছিলাম। পিছনে মঙ্গল ঘোষ এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। প্রশ্ন শুনে সচকিত। —আপনার জনের মতো বেশি গায়ে-টায়ে হাত দেন, এই তো?

কালো মেয়ের মুখে রক্ত উঠে এলো এক-ঝলক। ধড়ফড় করে পিছন ঘুরে তাকিয়েই সামনে ছুটল সে। চোখের উৎস থেকেই

হাসিটা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল মঙ্গল ঘোষের। আমাকে যেটুকু বোঝাবার ওই হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন।

ব্যবস্থাও তিনি করলেন। স্মৃতিকণার সঙ্গে দ্বিজু মল্লিকের নাতিটিকেও টাঙ্গায় টেনে নিয়ে বললেন, এবার থেকে আমাদের এই ব্যাচ—স্মৃতিদেবী লেখকের ভক্ত আর লেখক তাঁর গানের, অতএব বুঝতেই পারছেন।

পান খাওয়া দাঁতের সারি বার করে লিডার দ্বিজু মল্লিক বলেছেন, বেশ তো—বেশ তো।

মনের কোণেও কারো এতটুকু দুর্যোগের ছায়া ছিল না।

হাজার মন্দিরনগর এই কাঞ্চিপূরম বারাণসীর পর ভারতের দ্বিতীয় পুণ্যস্থান নাকি। দশহাজার শিব লিঙ্গের অবস্থান এখানে। হিন্দু বৌদ্ধ আর জৈন ধারার মিলন-ক্ষেত্র। বিশাল একাম্বরনাথ-এর মন্দিরের সামনের গোপুরমএর বিস্তৃত চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়েছে। আটতলা। একশ চুরাশি ফুট উঁচু। শিবকাঞ্চিতে মহাদেবের ক্ষিতি মূর্তি, কামেশ্বরের স্বর্ণ মূর্তি আর সহস্রলিঙ্গ মহাদেব। বিষ্ণুকাঞ্চিতে বিষ্ণু নারায়ণ অনন্তদেব সীতা আর পৃথিবীমাতার অবস্থান। ব্রহ্ম কাঞ্চিতে আছেন কাঞ্চিকামাখ্যা নারায়ণ আর লক্ষ্মী। অনন্তশয্যাও সেখানেই।

ঘুরে ঘুরে এইসব দেখার ফাঁকেই মেয়েরা কেউ কেউ খোঁজ করছিলেন এখানকার কাঞ্জীভরম শাড়িও তাঁরা একটু যাচাইবাছাইয়ের সুযোগ পাবেন কিনা।

হঠাৎই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে উঠল।

গণ্ডগোলের নায়ক মঙ্গল ঘোষ আগের মুহূর্তেও বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। দেবভূমিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার দল সঙ্গ নিয়েছে আমাদের। সংখ্যায় তারাও কম নয়। ছিয়াত্তর জনের দলটির একসঙ্গে ঘোরা সম্ভব নয়। আপনা থেকেই তারা ছ-সাতটি গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক ভাগের সঙ্গে একজন দুজন

করে পাণ্ডা চলেছে মন্দিরের ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য আর মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য। তাদের তামিল ভাষার প্রায় কিছুই আমাদের বোধগম্য নয়।

পাণ্ডাদের মাতব্বরটির দিকে চুপি চুপি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মঙ্গল ঘোষ। কামানো মাথায় মস্ত একটা টিকি। গোলগাল চেহারা। বয়েস পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তার গোল তুই চোখের লোভনীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল আমাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টের তিন রূপসী। লোকটি বেশ রসিয়ে দেখছিল তাদের, আর তাদের ভাগের পাণ্ডার সঙ্গে নিজেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঘুরছিল। বরাতক্রমে ওদের সঙ্গে আমরাও আছি। কাঁধে খোঁচা মেরে মঙ্গল ঘোষ লোকটার এই রমণীদর্শন পর্বটি আমাকে শুরু থেকেই দেখিয়েছেন। এই ব্যাপারটি কেন্দ্র করেই মাঝে মাঝে তাঁর ক্যামেরা ক্লিক করে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতে পাণ্ডার উপদ্রবের নজির সত্যি বলতে গেলে কোথাও নেই। কিন্তু এখানে এই বিশাল দলটির থেকে হয়তো বড় বেশি আশা করে বসেছিল তারা। আমাদের লিডার দ্বিজু মল্লিক ছয় পাণ্ডার মাথা পিছু তিন টাকার বেশি দেবার ব্যাপারে বেঁকে বসলেন। এই থেকেই মৃত্থ ঝকাঝকি এবং কথা কাটাকাটি। পাণ্ডাদের সেই মাতব্বরটি তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যেই বলে দিল বাঙালী এই রকমই নীচ আর অধার্মিক—যেতে দাও!

বলার পরেই নিজেদের জোড়া জোড়া চোখগুলোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা। মাতব্বর পাণ্ডার গলা আমাদের মঙ্গল ঘোষের দখলে। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল কয়েকটা ঝাঁকুনি আর শ্বাসরোধের ফলে মাতব্বরের জিভ বেরিয়ে এসেছে, চক্ষুও ঠিকরে পড়ার দাখিল।

ম্যানেজারের টানাটানিতে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তারা ছেড়ে দিল না। দেখতে দেখতে পিল পিল করে পাণ্ডা ছুটে আসতে লাগল চারদিক থেকে। ম্যানেজারের দল সমেত আমাদের আশীজনের

দলটাকেই ঘিরে ফেলল তারা। জনতাও আছে তাদের সঙ্গে। অকরুণ চোখ মুখ ওই পাণ্ডাদের। তাদের ভাষা দুর্বোধ্য। ক্রোধ স্পষ্ট। এবারে যারা ছুটে আসছে তাদের হাতে লাঠি-সোঁটা।

আমরা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

ওদের চিৎকার তর্জন গর্জনে একটাই অর্থ স্পষ্ট। যে-লোক তাদের মাতব্বরের গায়ে হাত দিয়েছে তাকে সামনে বার করে দিতে হবে। অন্যথায় দলের একটি লোককেও আস্ত ফিরতে দেবে না তারা।

আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে স্পষ্ট বুঝতে পারছি! আমরাই বা কি করব এখন? ম্যানেজার বলল, ক্ষেপে গেলে সাংঘাতিক লোক এরা—কি সর্বনাশ হবে এখন কে জানে।

নিরাপত্তার কারণে দ্বিজেন মল্লিক এবং আরো কয়েকজন মঙ্গল ঘোষকে ঠেলে আর একদিকে সরিয়ে নিয়ে গেছল। কিন্তু এখন নিজের নিজের প্রাণের আশঙ্কায় কাঠ সকলে। তাঁকে আগলে রাখার দায় কে নেবে?

মঙ্গল ঘোষ এগিয়ে এলেন। ম্যানেজারকে বললেন, ওই মাতব্বর পাণ্ডাকে বলুন আমি পাঁচ মিনিটের জন্য আগে শুধু তার সঙ্গে কথা বলব—তারপর তারা যা খুশি করতে পারে।

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে সেই চেষ্টায় এগুলো।

হ্যাঁ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার একটা ভোজবাজী দেখলাম আমরা। এত বড় জনসমষ্টি থেকে হাত বিশেক তফাতে দাঁড়িয়ে সেই মাতব্বরের সঙ্গে মঙ্গল ঘোষ কথা কইছে। মাতব্বরের কঠিন বদন, অগ্নিদৃষ্টি। কি বলতে বলতে মঙ্গল ঘোষ হাত তুলে একবার রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টের রূপসী তিনজনকে দেখিয়ে দিল। ধাক্কা খাওয়ার মতো একটা বিহ্বল ছাপ পড়তে লাগল মাতব্বরের চোখেমুখে।

পাঁচ মিনিটও লাগল না। পাণ্ডাদের দলের দু-তিন জনের কাছে এসে সে কি নির্দেশ দিয়ে ভিড় ঠেলে হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

বিমূঢ় বিশাল দলটির সমস্ত উত্তেজনা যেন মন্ত্রবলে উধাও। তারাও মাতব্বরকে অনুসরণ করে ফিরে চলল।

হঠাৎ কি ব্যাপার ঘটে গেল জানার জন্য উন্মুখ সকলে। কিন্তু মঙ্গল ঘোষ কারো সঙ্গে আর একটিও কথা না বলে নিজের টাঙ্গায় উঠে বসল।

না, সঙ্গী যাত্রীদের কৌতূহল মঙ্গল ঘোষ নিরসন করেন নি। জেরার জবাবে বলেছেন, ক্ষমাটমা চেয়ে নিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছে—কি আর শুনবেন। কিন্তু এতবড় জনসমষ্টির উদ্গত রোষ এত সামান্যতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল এ কারো মনে হয়নি।

হাসিমুখে রহস্যটা আমার কাছে উদ্ঘাটন করেছেন। বলেছেন, ওই মাতব্বরের ভিতরের চরিত্রটা আমার পাঠ করা হয়ে গেছে, সেই জোরে বেঁচে গেলাম।

—কি রকম?

রকম শুনে বিশ্বাস করব কি করব না ভেবে পেলাম না। মঙ্গল ঘোষ নিজের পরিচয় দিয়েছেন তামিলনাড়ুর ওমুক জনসংযোগ মন্ত্রীর সেক্রেটারী বলে। মন্ত্রীটি নাকি এইসব দেবালয়ের কমিটির সভাপতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর ওই রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টের তিন রূপসী আর দুই কন্দর্পকান্তির পরিচয়—তাঁরা পশ্চিম বাংলা থেকে আগত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং জনসংযোগ মন্ত্রীর সমাদরের অতিথি। মঙ্গল ঘোষ সরকারীভাবে তাদের তত্ত্বাবধানে এসেছেন।

পরিচয় সম্পূর্ণ করে মঙ্গল ঘোষ সেই মাতব্বর পাণ্ডাকে বলেছেন, ওই মহিলারা গোড়া থেকেই তোমার ওপর বিরক্ত, তুমি খুব অশোভনভাবে তাদের দেখছিলে।

মাতব্বর সরোষে বলেছে, মিথ্যে কথা!

—মিথ্যে কি সত্যি সেটা আমার এই ক্যামেরায় ধরা আছে। তোমরা আমাকে এখানে ধরে রাখতে পারো মেরে ফেলতে পারো—কিন্তু এতটুকু গণ্ডগোল হলে মহিলারা মন্ত্রীকে জানাবেন তুমি লুব্ধ

হয়ে তাঁদের সঙ্গে ইতরের মতো ব্যবহার করেছ সেইজন্যে আমি তোমার গলায় হাত দিয়েছি।

মাতব্বর মুখ লাল করে বলেছে, এতো বিলকুল ঝুট।

—আমার এতটুকু ক্ষতি হলে এই ঝুটটাই সত্যি বলে জানবে সকলে, সমস্ত কাগজে বেরুবে, তোমার কমিটির সভাপতি তাই জানবে—বিদেশের যাত্রীরাও এই শুনবে। এর ফল কি হবে তুমি জানো। আমি তোমাকে আর তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, তুমি তোমার দল নিয়ে সরে যাবে। আমি তোমাদের একাম্বরনাথের নাম নিয়ে শপথ করছি কোনো গণ্ডগোল না হলে এ ব্যাপার এখানেই মিটে যাবে।

বিচক্ষণ মাতব্বরটি নিজের চরিত্রের গলদ জানে। তিন মিনিটের মধ্যেই গণ্ডগোলের অবসান।

দম্ভ নয়, মানুষটির প্রতি পদক্ষেপে এমন একটা সহজ জোরের দিক আছে যা পুরুষের সম্পদ। যাত্রীদের অনেকেরই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা। মঙ্গল ঘোষ নিরুপায়ের মতো আমাকে বলেছেন মাদ্রাজের মতো আবার দিন কয়েক কোথাও কেটে পড়লে কেমন হয়?

সে-সময় স্মৃতিকণা আসছিল এদিকে। আমি হাসিমুখে তাকে দেখিয়ে জবাব দিলাম, স্মৃতিকণার গান পাবেন না তাহলে।

কাছে এসে স্মৃতিকণা জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছেন বুঝি?

—হ্যাঁ বোসো। তোমার মঙ্গলদাদাকে আটক করার মতো জমিয়ে একখানা গান করো দেখি।

স্মৃতিকণা এরই মধ্যে, দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে আমাদের সঙ্গে। মেয়েটা আসলে সপ্রতিভ এবং মিশুকও। নিজেকে গুটিয়ে রাখার স্বভাবটুকু বয়েসকালের ব্যাপার মনে হয়। আমার কেমন ধারণা মেয়েটা আনন্দে স্বতোৎসারিত ছিল কোনসময়ে—কিছু একটা ঘা পোড় খেয়ে নিজের চারদিকে একটু বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী টেনেছে।

নিরহঙ্কার। গাইতে বললেই বসে গান করে। এক বেঞ্চিতে

বসলে চলতি গাড়িতেও শুনতে খুব অসুবিধে হয় না। মঙ্গল ঘোষও কান পেতে শোনেন। হাতের মোটা বই অর্থাৎ দি সেলফএর মধ্যে ডুবে থাকলেও ভিতরের মানুষটাকে খুব শান্ত মনে হয় না আমার। কিন্তু গান শুনতে শুনতে এক-একদিন একেবারে নিশ্চল হতে দেখি তাঁকে। মেয়েটার ওই গলার সুর যেন তারও হৃদয়ের কোনো তারে বেজে চলেছে। এক-এক সন্ধ্যায় নিজেই আমাকে বলেন, আপনার ভক্তকে ডাকুন, একটু গান শুনি—

—আপনি বলুন।

—দেখুন মশাই, ওর কাছে আমার যেটুকু খাতির সে আপনার জন্যে, আপনার পাশে আছি তাই—এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। ডাকুন—

আগে সত্যি হলেও এখন তা নয়। আজই সকালে স্মৃতিকণা আমাকে বলছিল, ভদ্রলোককে অদ্ভুত লাগে এক-এক সময় আমার। কাছে থাকলে বেশ একটা জোরও পাওয়া যায়। তাই না?

খুনের দায়ে ভদ্রলোক সাড়ে ন-বছর জেল খেটে বেরিয়েছেন এ শুনলে স্মৃতিকণার মুখখানা কেমন হয় দেখার লোভ হয়েছিল। মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিয়েছি।

এই সন্ধ্যায় পর পর চারখানা গানের শেষে মঙ্গল ঘোষ চুপচাপ খানিক স্মৃতিকণার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতায় আপনার গানের নামডাক খুব?

—সেখানে আমাকে চেনেই না কেউ, ছোট একটা স্কুলে মাস্টারি করি।

—ছোট স্কুলে কেন?

—বড় স্কুলে আমাকে নেবে কেন?

ওইরকম সোজা মুখের দিকে চেয়ে থাকতে মঙ্গল ঘোষই পারেন। প্রশ্নটাও খুব প্রত্যাশিত নয়।—আপনার সব ইন্টারেস্ট এখন তাহলে শুধু গান?

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে মেয়েটা বিব্রত বোধ করছে লক্ষ্য করেছি। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

—তাহলে নাম-ডাক যাতে হয় সে চেষ্টা করেন না কেন?

বিব্রত হাসিমুখেই স্মৃতিকণা জবাব দিল, নাম-ডাকের লোভ আর নেই···নিজের একটা গানের স্কুল হবে, ভালো ভালো জনাকতক গাইয়ে বাজিয়ে থাকবে সেখানে, অনেক মেয়ে গান শিখবে—এই স্বপ্ন দেখতাম।

—স্বপ্ন কেন?

হেসে সহজ হবার চেষ্টা স্মৃতিকণার।—তাছাড়া আর কি, আমার যা অবস্থা···

আমি চুপচাপ শুনছিলাম। দুজনকেই দেখছিলাম। স্মৃতিকণার এই অনাড়ম্বর দিকটা ভালো লাগছিল। মঙ্গল ঘোষের কৌতূহলের ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সজাগ ছিলাম। স্মৃতিকণা উঠে যাবার পরেও ভদ্রলোক বিমনা খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরলেন।

—আপনি তো লেখক, এই বয়সের একটি মেয়ে শুধু গান সম্বল করে থাকবে—গান সম্বল করে বাঁচবে ভাবে কেন?

জবাব দিলাম, হয়তো এর থেকে বড় কিছু আকর্ষণ ওর সামনে আসেনি কখনো।

গলার স্বর বদলালো মানুষটার। অকরুণ শোনালো।—সামনে আসেনি না শুধু ওই স্বপ্ন দেখে বলে আর সব আকর্ষণ বাতিল করেছে বা ঠেলে সরিয়েছে?

আমি চেয়ে আছি। তিনিও। বললাম হতে পারে।···ঠেলে সরানোর এরকম নজির আপনার জানা আছে তাহলে?

আমার মুখের ওপরেই যেন একটা ঝাপটা মেরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর নিচের বেঞ্চে পা রেখে রেখে ওপরের বাঙ্কে উঠে গেলেন।

…স্মৃতিকণা নয় আমার সমস্ত কৌতূহল এই একজনকে ঘিরেই।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনো পাহাড়ের অঙ্গ বিদীর্ণ করা পাথুরে দুর্গের দিকে এগিয়ে চলেছি। দুর্গের চূড়ায় একটা মন্দির। সমতল ভূমি থেকে দু'শ তিয়াত্তর ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে এই ঋজু কঠিন পাথুরে দুর্গ। তার মাথায় গণেশ মন্দির। ত্রিচিনপল্লীর বিখ্যাত রকফোর্ট মন্দির।

চূড়ায় ওঠার আগে পর্যন্ত পাহাড়ের গহ্বরে অনেকগুলো ছোট বড় গুহার মতো তৈরি করা হয়েছে। এগুলোকে গুহা মন্দির বলা যেতে পারে। এরকম বিশাল নাটমন্দিরও আছে। এই নিটোল পাথুরে ছন্দ ভালো লাগল। ভেতরের দেয়ালের গায়ে বহু রকমের খোদাই করা চিত্রসম্ভার আর দেবদেবীর মূর্তি। পল্লবরাজা মহেন্দ্র বর্মার কীর্তি এটি। চূড়ার গণেশ মন্দির শোনা যায় ধর্মরাজ সংহতির নায়ক শিবাজীর সৃষ্টি।

স্থাপত্য আর ভাস্কর্য দুই-ই দেখার মতো।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আমরা। আমি স্মৃতিকণা আর মঙ্গল ঘোষ। শেষের ভদ্রলোক কখন চোখের আড়াল হয়েছেন খেয়াল করিনি। স্মৃতিকণাকে জিজ্ঞাসা করতে সেও এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

খুঁজতে খুঁজতে একটা গুহার ওধারের একেবারে নিরিবিলি কোণের একটা চিলতে জায়গায় তাঁর দেখা পেলাম। কাবেরীর গা-ঘেঁষে রকফোর্টের একেবারে শেষপ্রান্ত ওটা। সেখান থেকে দূরে রঙ্গনাথনের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখা যায়।

কিম্ভূতদর্শন একটা লোকের সামনে মেঝের ওপরেই জমিয়ে বসে গেছেন মঙ্গল ঘোষ।

আমরা এগিয়ে আসতে বললেন, মন্দির দেখে কি হবে, মানুষ দেখুন।

ওই মানুষের দিকে ভালো করে তাকিয়ে আমরা ধাক্কাই খেলাম একটা। মঙ্গল ঘোষের বাংলা কথার এক বর্ণও বোধগম্য হল না তার। ভুরুসংলগ্ন মস্ত আধ-শুকনো ক্ষতচিহ্নটার তলা থেকে কোটরাগত দুটো চকচকে চোখের দৃষ্টি আমাদের মুখের ওপর।

লোকটার বয়েস পঞ্চাশের ওধারে নিশ্চয়। মাথায় ঝাঁকড়া লালচে চুল পিছন দিকে একটা চওড়া সোনালি ফিতে দিয়ে বাঁধা। লোকটার পা থেকে গলা পর্যন্ত যাত্রার দলের রাজার মতো বর্ণবাহার পোশাক। কিন্তু সমস্ত বর্ণই কালচে মলিন। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া-খোঁড়া। লোকটার হাতে পায়ে গায়ে মুখে বহু ক্ষতচিহ্ন। কিন্তু খুব বেশি দিনের ক্ষত নয়। কেউ যেন আঘাতে আঘাতে এই দশা করেছে। গায়ের রংদার লম্বা কোর্তায় চাপ চাপ শুকনো কালচে রক্তের দাগ কতগুলো দগদগে ক্ষতচিহ্ন সামলে লোকটা এখনো বেঁচে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য। সামনে একটা তলোয়ার পড়ে আছে তাতে রক্তের দাগ।

দেখে মনে হল মুমূর্ষু দশা। চোখ টান করে আর একবার আমাদের দেখে নিয়ে লোকটা ভাঙা হিন্দীতে মঙ্গল ঘোষকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার লোক?

—হ্যাঁ আমার লোক, তুমি বলো।

—আমাকে রঙ্গনাথনের কাছে নিয়ে যাবে?

মঙ্গল ঘোষ মাথা ঝাঁকালেন, বললাম তো নিয়ে যাব—আজই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। তুমি জীবন পণ করে যুদ্ধে নেমেছিল কবে? কোথায়?

—ছ' দিন আগে ভোর রাতে কাবেরীর ধারে।

—কার সঙ্গে যুদ্ধ? কেন যুদ্ধ?

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে লোকটার। বলল, আমার দলে এক নয়া মরদের সঙ্গে। মরদানী দখলদারির লড়াই।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। স্মৃতিকণা বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে

তাকে। মঙ্গল ঘোষ উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করলেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে বলতে···আস্তে আস্তে বলো—আমি আজই তোমাকে শ্রীরঙ্গপুরে রঙ্গনাথনের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

এইটুকু যেন একমাত্র আশ্বাসের বস্তু তার। বাসনার শেষ স্বপ্ন। এই পরিবেশে রক্তাক্ত ওই ক্ষতবিক্ষত লোকটা সামনে না থাকলে এই দিনের গল্পে বিশ্বাসের দাবী হাস্যকর মনে হত।

···লোকটার নাম যশোয়ন্ত সিং। বাগলালার মানুষ। এই কিছুদিন আগেও মস্ত দল ছিল তার। একসময় ডাকাতি করে বেড়াতো। সেসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভালোমানুষ হয়েছিল। এখনো মস্ত ক্ষেতখামার আছে তার। খামারের মোষ আছে অনেকগুলো, ভেড়া আছে পাঁচ কুড়ির বেশি। দলের সব লোক সেই খামারে কাজ করত।

তার বয়েস এখন তু'কুড়ি দশ। ছেলে-পুলে আছে। কিন্তু বউ ছিল না। পাঁচ সাল আগে বউ মারা গেছে। কিন্তু নিজেকে জোয়ান মরদ ভাবত যশোয়ন্ত। সকলে মুখ বুজে তার কথা শুনত শাসন মানত। বউ মরার পরে এক দোস্তএর লড়কিকে সে জোর করেই ঘরে এনেছিল। তার নাম চম্পা। দোস্ত প্রাণের ভয়ে মেয়েকে তার হাতে সঁপে দিয়েছিল।

চম্পার বয়েস তখন এককুড়িও নয়। গোড়ায় গোড়ায় মরদের বাধ্য ছিল খুব। যতো বয়েস বাড়তে লাগল ততো তার রূপ খুলতে লাগল আর বেয়াড়াপনাও বাড়তে লাগল। কিন্তু যশোয়ন্ত তখন তার রূপে এমনিই মুগ্ধ যে উচিত শাসন করতে পারত না। আর শাসন করতে গেলে মেয়েটা ফুঁসে উঠত, তখন আরো ভালো লাগত তাকে।

মেয়েটার বয়েস যখন এক কুড়ি পাঁচ আর রূপের ছটায় যখন সর্বঅঙ্গ ঝলমল—তখন থেকে নষ্টামি দুষ্টামি আরো বাড়তে লাগল। যশোয়ন্তর দলের ছেলে রূপ সিং। ছেলেবেলা থেকে তার কাছে আছে। জোয়ান মরদ হয়ে ওঠার পর থেকে তারও বেয়াড়াপনা

বাড়ছিল। শাসন মানতে চাইত না। তার সঙ্গেই চম্পার ভাব-সাব টের পেল যশোয়ন্ত সিং। চম্পাকে ধরে আচ্ছা করে পিটল একদিন আর রূপ সিংকে তাড়িয়ে দিল।

তলায় তলায় তবু ওদের মধ্যে আসনাই চলতে থাকল।

মেয়েটার মতিগতি যাতে বদলায় সেইজন্যেই তাকে আর দলের দু-পাঁচজনকে নিয়ে পাহাড়ের এই গণেশ মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল যশোয়ন্ত। টের পেয়ে নিজের সঙ্গীসাথী নিয়ে রূপ সিংও এলো চম্পাকে ছিনিয়ে নিতে। চম্পাও তার সঙ্গে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে। রূপ সিং শাসিয়ে জানিয়ে দিল, চম্পাকে সে এমনি ছেড়ে দেয় তো ভালো, নইলে দলের সকলকে খতম করেই সে চম্পাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

এ অবস্থায় নিরুপায় যশোয়ন্ত সিংএর ধমনীতে সেই পুরনো রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। নিজেকে এখনো জোয়ান মনে ভাবে সে। আগে রূপ সিংকে শায়েস্তা করবে তারপর চম্পাকেও চরম শাস্তি দিয়ে অন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবে।

বাঙলাদার বীরের ঐতিহ্য স্মরণ করে রূপ সিংকে মরণ যুদ্ধে আহ্বান জানালো সে। যে জিতবে চম্পা তার। শয়তান রূপ সিং প্রথমে রাজি হয়নি, বলেছে দু'কুড়ি দশ বছরের মানুষ মিছিমিছি প্রাণটা খোয়াবে কেন।

জবাবে যশোয়ন্ত সিং তার মুখে থুথু দিয়েছে।

এভাবে অপমানের পর সে মরণযুদ্ধে নামতে রাজি হয়েছে। সরকার টের পেলে বাধা দেবে। তাই চুপিচুপি ভোর-ভোর সময়ে কাবেরীর ধারে ফয়সলার ব্যবস্থা হয়েছে।

...হ্যাঁ সেই মরণ যুদ্ধ চম্পাও সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে। যশোয়ন্ত সিং সত্যি জানত না তার দিন সত্যিই গেছে। হাজার চেষ্টা করেও সে রূপ সিংএর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। সে তাকে আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করল, কিন্তু প্রাণে মারল না। যশোয়ন্ত সিং ক্ষিপ্ত

হয়েছে আবার কাকুতি মিনতিও করছে—তবু ওই শয়তান প্রাণে মারল না তাকে। চম্পাকে নিয়ে চলে গেল।

যশোয়ন্ত সিংএর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তার লোকজনেরা তাকে এই গুহা মন্দিরে ছেড়ে দিয়ে গেল। গণেশের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল, তাই এখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় অনাহারে জীবন দেবার সংকল্প। কিন্তু এখন ভাবছে গণেশের পুজো ব্যর্থ হয়েছে, জীবন দেবেই যখন রঙ্গনাথনের পায়েই দেবে—সেখানে গিয়ে অস্ত্র বিসর্জন দেবে। প্রাণ দেবে বলেই ছ'টা দিন শুধু জল খেয়ে কাটাচ্ছে সে। কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে হাসপাতালে রেখে আসতে চেয়েছিল তাকে। সে তাদের গালাগালি করে তাড়িয়েছে। যাত্রীদের কত জনের কাছে সে সকাতরে অনুরোধ করেছে তাকে শ্রীরঙ্গমে দিয়ে আসা হোক, কিন্তু কারো সময় নেই, দিল্ নেই।

আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মঙ্গল ঘোষ চকিতে ভেবে নিলেন কি। বললেন, তুমি ছ'দিন না খেয়ে আছো, কিছু খেয়ে নাও তারপর নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, নহীঁ, কবভি নহীঁ।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, আমরা পরদেশী মানুষ, আমাদের তুমি বিপদে ফেলতে চাও কেন। এ অবস্থায় যেতে দিলে তুমি পথেই মরে যাবে—তখন না পেলে গণেশকে না রঙ্গনাথনকে। তার থেকে ওখানে জিন্দা পৌঁছে যা খুশি কোরো।

চোখের ইশারায় আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি দশ মিনিটের মধ্যে এক ঠোঙা বেশ ভালো ভালো খাবার নিয়ে এলেন। তারপর নিজের হাতেই সে-খাবার লোকটার মুখে গুঁজে দিতে লাগলেন।

দৃশ্যটা দেখার মতো। মঙ্গল ঘোষের ধীরে সুস্থে লোকটাকে খাওয়ানোর তাড়া আর উপোসী মানুষটার কোনো রকমে খাওয়া শেষ করে শ্রীরঙ্গমে ছোটার তাড়া। বৈষ্ণবদর্শনের কেন্দ্রস্থল শ্রীরঙ্গম। গণেশকে ছেড়ে যশোয়ন্ত সিং যাবে শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়ে।

মঙ্গল ঘোষ কথার খেলাপ করলেন না। পয়সায় সব হয়। লোকজনের সাহায্যে তাকে গুহার অভ্যন্তর থেকে বাইরে আন হল। সেখান থেকে ট্যাকসিতে শ্রীরঙ্গম তিন মাইল মাত্র পথ।

আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মঙ্গল ঘোষের আর কোনে আগ্রহ দেখা গেল না। ভদ্রলোক ভাবছেন কিছু। ঠোঁটের ফাঁকে এব টুকরো হাসি ঝুলছে। স্মৃতিকণা কেন যেন গম্ভীর একটু। কাবেরী ধার ধরে পাশাপাশি হাঁটছি তিনজনে।

আমি বললাম, আশ্চর্য, আজকের দিনেও এরকম কাণ্ড হয়।

মঙ্গল ঘোষ আলতো করে জবাব দিলেন, হবে না কেন, পঁচিশ গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি নিজের চোখেই এ-রকম একটা লাভার্স ডুয়েল দেখেছি—দুই প্রেমিক আর এক প্রেমিকা ভিন্ন অপর কেউ ছিল না সেখানে। জঙ্গলের একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে তারা ফয়সলা করতে এসেছিল।

গাম্ভীর্য ভুলে স্মৃতিকণা হাঁ করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আমারও চোখে মুখে অবিশ্বাস।—আপনি নিজের চোখে এ-রকম মরণযুদ্ধ দেখলেন?

—দেখলাম বইকি,মারাত্মক মরণযুদ্ধ। জায়গা বোধহয় ঠিক করাই ছিল, দুই ভদ্রলোক আর তাদের লেডি এলো তারপর দেড় মিনিটের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অদূরে বসে লেডি চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। চোখ ঝলসে যাওয়ার মতোই রূপ আর স্বাস্থ্য তার। এখানেও যে বয়স্কটি তার রমণীর ওপর অধিকার ছাড়তে নারাজ তারই কাল হল। আধঘন্টার মধ্যেই সে মুমূর্ষু ধরাশায়ী। রূপের ডালি লেডি কারো হৃদয়-বেদনার ধার ধারে না দেখলাম, সেই মুমূর্ষুর সামনেই বিজয়ী তরুণকে আদর করতে করতে নিয়ে চলে গেল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাস ঠেলে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।—তারপর? আপনি কি করলেন?

নির্লিপ্ত মুখে মঙ্গল ঘোষ জবাব দিলেন, যা করা উচিত তাই

করলাম, ঝোপের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে এক গুলিতে পরাজিত ভদ্রলোকের ভবযন্ত্রণার অবসান করে দিলাম।

স্মৃতিকণা আর আমি ছুজনেই হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। আমার গলা দিয়ে আবার বেরিয়ে এলো, তার মানে কোনো জানোয়ার টানোয়ার নাকি?

তিনটে বাঘ। আমার বিবেচনায় মানুষের থেকে কম ভদ্র নয়। কারো বউকে পছন্দ হলে থাবা লুকিয়ে হাত চাটে না, গোপনে দখল নিতে আসে না—স্পষ্ট ঘোষণায় জানান দিয়ে ফয়সলা করে নেয়। আর ওদের মেয়েদের দেখেও কোনো কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলবে না, ফ্রেল্‌টি দাই নেম ইজ উওম্যান!

হালকা মন্তব্যের সঙ্গে শেষের হাসিমাখা চাউনিটা স্মৃতিকণার মুখের ওপর ঘুরে গেল।

লালচে মুখ দেখে মনে হল স্মৃতিকণা এবারে ঝাঁঝালো কিছুই বলে বসবে। কিন্তু ছুই ঠোঁট এঁটেই থাকল শেষ পর্যন্ত।

মুখে না বললেও স্মৃতিকণার মনের ভাব বুঝতে কষ্ট হয় নি। লোকটাকে রমণীবিদ্বেষী ধরে নিয়েছে। যশোয়ন্ত সিংএর সঙ্গে তাঁর আচরণ দেখে আর বাঘের গল্প শুনে আমারও সেই রকমই মনে হয়েছিল। সব থেকে বেশি মনে হয়েছিল তাঁর মুখের সেই হাসি দেখে। আরো কি মনে হয়েছিল স্মৃতিকণার ধারণা নেই। তাঁর গল্প থেকেই বোঝা গেছে মানুষটা শিকারী। ওই হাসিমাখা চাউনির তলায় তলায় আমি যেন এক ধরনের ক্রুর খেদ দেখেছি। রমণীর প্রতি বিদ্বেষ তাকে বিরাগের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে এ-রকম সম্ভাবনা মনের কোণেও ঠাঁই পায় নি। বরং উল্টো সম্ভাবনাটাই মনে বেশি এসেছে। ওই বিদ্বেষের ফয়সলার লক্ষ্য নিয়ে তিনি যদি কোনো রমণীকে আকর্ষণ করেন সেও অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারীর মতোই অকরুণ কিছু ব্যাপার হয়ে বসতে পারে।

কিন্তু পরের ঠাণ্ডা চিন্তায় নিজের এই বিশ্লেষণও বেখাপ্পা লেগেছে। কারো বুকের তলায় দরদরে একটু সরু বুননির আভাস পেলেও এই লোকের ভিতরটা কতখানি স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে সে আমি হাওড়া স্টেশান থেকেই দেখে আসছি। কোনো নতুন জায়গায় এলে এখনো মঙ্গল ঘোষ তাগিদ দেন, আগে বাড়িতে চিঠি লিখুন।

দরদের আর একটা নির্লিপ্ত অথচ স্বতন্ত্র নজির দেখলাম মাহুরা ছাড়ার আগে। অথচ সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দলের আর পাঁচ জনের মতো আমারও ভিতরে ভিতরে সংশয়ের আঁচড় পড়ছিল না একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি না।

মাহুরায় পৌঁছেছি ভোরে। ছেড়ে যাব রাত আটটার পরে।

খুব ভোরে ধনুষ্কোটি হয়ে রামেশ্বরে পৌঁছনোর প্রোগ্রাম। অতএব আমাদের মাদুরায় অবস্থানের মেয়াদ বারো ঘণ্টারও বেশি।

এখানেও দূরপাল্লার ভ্রমণসূচী নেই কিছু। মাদুরা শহরের মধ্যেই যা-কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। যাত্রীরা তাই ছোট ছোট দল বেঁধে যে-যার খুশি মতো বেরিয়ে পড়েছে। কেউ রিকশ নিয়েছে কেউ টাঙ্গা নিয়েছে কারো বা পায়ের ওপর আস্থা।

এখানে এসে স্মৃতিকণা হঠাৎ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। অথচ আর কোনো দলের সঙ্গে ভিড়তে দেখলাম না তাকে। সকাল থেকেই বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে। যাত্রীরা বেশির ভাগ খুব ভোরে স্নান সেরে নিয়েছে। প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ। স্মৃতিকণাও স্নানের পর পিঠের ওপর ভিজে চুল ছড়িয়ে চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু খেল না কিছু।

আমাদের কামরার প্রায় সকলের আগেই একলা নেমে গেল। আমার কেমন মনে হল মেয়েটার মুখে এক ধরনের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। সকাল থেকে তার পাশের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার সঙ্গেও কথা বলতে দেখিনি। আমার সামনের মানুষটি অর্থাৎ মঙ্গল ঘোষ কিছু লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হল না। কিন্তু রাস্তায় নেমে উনিই প্রথম বললেন, মাদুরায় এসে আপনার ভক্তটি হঠাৎ আমাদের পরিত্যাগ করল কেন বোঝা গেল না।

অর্থাৎ লক্ষ্য তিনিও করেছেন।

লিডার বিজু মল্লিকের সঙ্গ ছাড়ার পর থেকেই ওই মেয়ে পথের সর্বত্রই আমাদের সঙ্গে আছে। এই নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য কানে গেছে কিনা ভেবে পেলাম না। সকাল থেকেই তার মুখখানা কঠিন মনে হয়েছে। আমার প্রতি বিরূপতার কোনো কারণ নেই। এই ভদ্রলোকই এর মধ্যে বেফাঁস কিছু বলেছেন কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। না, সাক্ষাতে অন্তত তেমন কিছু কানে আসে নি। জবাব না দিয়ে আমি মঙ্গল ঘোষেরই মুখখানা দেখে নিলাম এক দফা।

মন্দির আর প্রাসাদের প্রাচীন পটভূমিতে আধুনিক শহর মাদুরা দক্ষিণ ভারতের এথেন্স—দি সিটি অফ ফেস্টিভালস। এখানকার সব থেকে বড় দ্রষ্টব্য মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দির। সমস্ত শহরটাই যেন এই বিশাল বিস্তৃত মন্দির এলাকাটিকে ঘিরে সজাগ মুখর হয়ে আছে।

মন্দির এলাকার ভিতরেও আর একখানা বিকি-কিনির রাজ্য। সে সব পেরিয়ে আসতে আসতে মঙ্গল ঘোষ বললেন, আর কিছুদিন আগে এলে এখানে মীনাক্ষী আর সুন্দরেশ্বরের বিয়ের উৎসব দেখতে পেতেন—এপ্রিলের মাঝামাঝি হয়, সেটাই সব থেকে বড় উৎসব এখানকার।

হর-পার্বতীর বিয়ে। এটা কোনো উৎসবের কাল নয়, তবু এখানকার জনসমাবেশের মাতোয়ারা মনের হদিস থেকে সেই উৎসবের চিত্র কল্পনা করা যায়। দেবী মীনাক্ষী সংসার থেকে কাউকে দূরে সরে যেতে বলছেন না। পরাশক্তি এখানে সুন্দরের পরিণয়পাশে আবদ্ধ, সংসার মন্ত্রে দীক্ষিত। তাই সম্ভবত এত প্রিয়।

হাজার স্তম্ভের বিশাল মণ্ডপের ভিতর দিয়ে চলেছি। সৃষ্টির এ এক বিপুল মহিমাই বটে। প্রতিটি স্তম্ভে ষোড়শ শতকের স্থপতিদের কালজয়ী শিল্পকারু। এক যুগের অনুশীলনেও দর্শকের শুধু এটুকুর মর্মই অধিগত হবে কিনা সন্দেহ।

পাঁজরের কাছে মৃদু খোঁচা খেয়ে আত্মস্থ হলাম। মীনাক্ষীর মন্দিরের সামনে ভিড়। সেই ভিড় এড়িয়ে অদূরের একটা স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে স্মৃতিকণা চক্রবর্তী। খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো। হাতে পুজোর ডালি।

সহস্র মানুষের কল-কোলাহলের মধ্যে এমন একটি বিচ্ছিন্ন সমাহিত মুখ আমি আর বুঝি দেখিনি। মন্দিরের প্রবেশ পথের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত। কিন্তু ও-যেন সমস্ত ব্যবধান পেরিয়ে দেবী মীনাক্ষীর মুখখানাই দেখছে নির্নিমেষে। আর নিজেকে নিবেদন করে চলেছে।

আমরা কাছে এসে দাঁড়ালাম। হাত পাঁচেকের মধ্যে। স্মৃতিকণা টের পেল না। মুখ ফেরাল না। চোখে পলক পড়ল না। আমার ভয় হল মঙ্গল ঘোষ বুঝি ডেকে বসেন তাঁকে। কিন্তু না। তিনিও দেখছেন শুধু। এত কাছে থেকে যেভাবে দেখাটা প্রায় অশোভন তেমন করেই খুঁটিয়ে দেখছেন।

আমি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম তাঁকে। সরে এসে তিনি শুধু বললেন, আশ্চর্য।

দুপুরে খাওয়ার সময়েও স্মৃতিকণা অনুপস্থিত। আমার স্থির ধারণা এখানে এসেই মেয়েটার যে ব্যতিক্রম দেখেছি তার সঙ্গে দেবী মীনাক্ষীর চরণে কিছু নিবেদনের যোগ আছে। বছর ছয় আগে এই মেয়ে আরো একবার এখানে এসেছিল মনে পড়ল। নিজেই বলেছিল। তখন কোনো রকম মানত-টানত করে গেছল কিনা কে জানে। কিন্তু একলার জীবনে এতবড় লক্ষ্যবস্তুই বা কি হতে পারে?

চুপচাপ খাওয়া সেরে মঙ্গল ঘোষ তাঁর বই খুলে বসেছেন। কিন্তু 'দি সেলফ'এর একটি দরজাও উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন মনে হল না। বই থেকে মুখ তুলে এক-একবার স্মৃতিকণার শূন্য বেঞ্চটার দিকে তাকাচ্ছেন, আর এক-একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। ঘণ্টাখানেক বাদে বই ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। অস্ফুট স্বরে জানান দিলেন, ঘুরে আসি।

কোথায় যাচ্ছেন অনুমান করতে পারি। ডাকলে আমিও সঙ্গে যেতাম। না ডাকাটা কেন যেন মনঃপূত হল না। ওই মেয়ে আজও আমার কাছে যতো সহজ এই লোকের কাছে ততো নয়।

দুপুর গড়িয়ে চলেছে। অনেকের দিবানিদ্রা সাঙ্গ হয়েছে। কামরার একটা মেয়ে সকাল থেকে অনুপস্থিত সেটা সকলেই খেয়াল করছে ক্রমশ। কেউ কেউ আমাকেই জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গেল বা এখানে কোনো আত্মীয়-পরিজনের কাছে গেল কিনা। যাই হোক তখন পর্যন্ত উতলা বোধ করার কারণ নেই কারো। বিকেল হবার

আগে কামরাসুদ্ধ লোক নেমে গেল। দেখেশুনে যাচাই বাছাই করে এখানে কেনার মতো অনেক কিছু আছে। যাত্রীদের এই কেনার ঝোঁকটাও অনেক সময় উপভোগ্য মনে হয়েছে। কেনা-কাটার পর কে জিতল কে ঠকল সেও এক মুখরোচক গবেষণার বিষয়।

প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করছিলাম। বিকেলের আলোতেও টান ধরেছে তখন। দাঁড়িয়ে গেলাম। মঙ্গল ঘোষ আসছেন। বিস্মিত চিন্তাচ্ছন্ন মুখ।

কাছে এসে বললেন, স্মৃতিকণাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। টাঙ্গা নিয়ে বসন্ত মণ্ডপেও গেছলাম—সেও নাকি দেবীর আর এক জাগ্রত স্থান। কি ব্যাপার বলুন দেখি—এর মধ্যে আসে নি তো?

মাথা নাড়লাম। আসে নি। বললাম, এখানে কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় থাকতে পারে—হয়তো দেখা করতে গেছে।

মঙ্গল ঘোষ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর বললেন, কিন্তু আপনি তা ভাবছেন না, আপনিও চিন্তা করছেন।

সত্যি ভাবছি না। সত্যি চিন্তা করছি। মুখের দিকে চেয়ে এই লোক সেটা বুঝল কি করে জানি না।

সাতটা সোয়া সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে গেল ঘড়িতে। স্মৃতিকণার দেখা নেই।

আটটার কয়েক মিনিট পরে গাড়ি ছাড়ার কথা।

আর চুপ করে থাকা গেল না। ম্যানেজারকে ডেকে বললাম। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরক্ত মুখ।—নিশ্চয় কেনাকাটায় বসে গেছেন, এই এক ব্যাপারে মেয়েদের নিয়ে সময়-সময় কি-যে ভুগতে হয়!

আরো পনের বিশ মিনিটের মধ্যে শুধু আমাদের কামরায় নয় সব ক'টা কোচের যাত্রীরাই জেনে গেল, একজন এখনো ফেরেনি। ম্যানেজার আর তার লোকজন প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশানের বাইরে ছোটাছুটি শুরু করেছেন। ম্যানেজার এক ফাঁকে এসে জানালো,

যে গাড়ি আমাদের টেনে নিয়ে যাবে সেই গাড়ি লেট—কতক্ষণ লেট সঠিক বলতে পারে না। কিন্তু মহিলার তো আর লেটএর খবর জানা নেই, তিনি আসছেন না কেন।

অন্য কামরার যাত্রীরা এসে আমাদের কাছেই খবর নিতে লাগল হন্তদন্ত হয়ে লিডার দ্বিজু মল্লিক এলেন।—সে কি মশাই। মেয়েটা আপনাদের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করে সর্বদা, সকাল থেকে নিপাত্তা আর আপনাদের এতক্ষণে হুঁস হল?

মঙ্গল ঘোষ হঠাৎ তিরিক্ষি জবাব দিলেন, মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের হুঁসটা আপনার মতো নয়—এসে গেলে এবার থেকে আপনার হেপাজতে ছেড়ে দেব।

দ্বিজু মল্লিক প্রস্থান করলেন।

যাত্রীদের সঙ্গে ম্যানেজারের দ্রুততালের আলোচনা কানে এলো। সময়ে উপস্থিত থাকা না থাকার দায়িত্ব যাত্রীর; এই কারণে যাত্রার প্রোগ্রাম বানচাল হতে পারে না। যাত্রীরা কেউ গাড়ি মিস করলে পরে কোথাও 'মিট' করে থাকেন

স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে ঠাসাঠাসি ভিড় এখন। নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি ছাড়লে আর পাঁচ মিনিটও নেই। আমাদের দলের অর্ধেকের বেশি যাত্রী উন্মুখ হয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। গাড়ি লেট সকলেই জানে —মনে প্রাণে কেউ চাইছে না গাড়ি সময়ে ছাড়ুক।

বিরক্তি-মাখা মুখখানা কঠিন দেখাচ্ছে মঙ্গল ঘোষের। দুজনেই পাশাপাশি কামরার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আর ভিড়ের মধ্যে আতিপাতি করে চেনা মুখ খুঁজছিলাম। মঙ্গল ঘোষ হঠাৎ বললেন, গাড়ি ছাড়ার আগে যদি আসতে না পারি কাল কোনো এক সময় রামেশ্বরে দেখা হবে—ভাববেন না।

বলেই হনহন করে এগিয়ে গিয়ে চোখের পলকে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে।

যে গাড়ি আমাদের টেনে নিয়ে যাবে সেই গাড়ি এসে লাগল রাত ন'টায়। এবারে দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছাড়বে। যাত্রীরা যে যার জায়গা নিয়ে বসেছে। এর আগেই সকলে জেনেছে স্মৃতিকণা চক্রবর্তীকে খোঁজার তাড়ায় আরো একজন উধাও হয়ে গেছে। অনেকে বিনা মন্তব্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে তাও লক্ষ্য করেছি।

আমি কামরায় উঠতে পারছি না। দুশ্চিন্তার ভিতর ছেয়ে আছে আমারও। এত লোকের মধ্যে একটি মাত্র মানুষই খোঁজার তাগিদে ছুটে গেছে। কিন্তু থেকে-থেকে মনে পড়ছে ওই মানুষ খুনের আসামী। দীর্ঘকাল জেল খেটেছে। এই মুহূর্তে এ-কথাই বার বার মনে আসছে কেন জানি না। স্মৃতিকণার হদিস মিললেও এই একটা রাত এই লোকের সঙ্গে সে কোথায় কাটাবে? ট্যাকসিতে··· রামেশ্বরের পথে?

একটা অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে টেনে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না।

প্রথম ঘণ্টা বাজল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ আমি। স্মৃতিকণার একখানা হাত মঙ্গল ঘোষের হাতের মুঠোয়—ছুটতে ছুটতে আসছে দুজনে। স্মৃতিকণা অত জোরে ছুটতে পারছে না। কিন্তু মঙ্গল ঘোষ যেন হিঁচড়ে ছোটাচ্ছেন ওকে।

জানালা দিয়ে অনেকেই দেখছে এই দৃশ্য। এসেছে-এসেছে রব পড়ে গেল। কিন্তু কামরা থেকে নামার উপায় নেই কারো। গাড়ি ছাড়ল বলে।

একেবারে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে মঙ্গল ঘোষ হাত ছাড়লেন স্মৃতিকণার। এ-কামরার সকলের জোড়া জোড়া চোখ তার মুখের ওপর। মেয়েটার শুকনো মুখ লাল। এ-রকম বিড়ম্বনার মধ্যে আর পড়ে নি বোধহয়। হাঁপাচ্ছে তখনো।

সকলের উদ্দেশে মঙ্গল ঘোষ বললেন, এখন আর কেউ কিছু

জিজ্ঞেস করবেন না, ওঁর শরীর খারাপ, মন্দিরের চাতালে প্রায় অজ্ঞানের মতো পড়ে ছিলেন—

স্মৃতিকণা চোখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে। এই থেকেই আমার কেমন মনে হল জবাবদিহিটা মঙ্গল ঘোষের মন-গড়া। আর মনে হল, সন্ধিৎসু জেরার হাত থেকে অব্যাহতির আশায় ওই মেয়ে যেন ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গাড়ি সবে নড়েছে। তার মধ্যেই ম্যানেজার উঠে এসেছে। মঙ্গল ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে আবার নামালেন তাকে।—খানিকটা গরম দুধ চাই—এক্ষুনি !

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে চলতি গাড়িতেই গরম দুধ এলো। সেই দুধ গেলাসে ঢেলে স্মৃতিকণাকে খাইয়ে, তাকে শুয়ে পড়তে বলে মঙ্গল ঘোষ নিজের জায়গায় অর্থাৎ আমার পাশে এসে বসলেন। তখনকার মতো আমিও কিছু জিজ্ঞেস করলাম না, উনিও নিজে থেকে কিছু বললেন না। কারণ, কামরার সকলের মনোযোগ এখনো তাঁর দিকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্টেশান এলো আবার। ম্যানেজারের সঙ্গে এবারে অনেকেই সাগ্রহে খবর নিতে এলো। এলেন দ্বিজু মল্লিকও। মঙ্গল ঘোষ একই কথা বললেন। বললেন, ঘুমের বড়ি-টড়ি থাকলে পাঠিয়ে দিতে।

স্মৃতিকণা তখন উল্টো দিকে মুখ করে গুটিসুঁটি শুয়ে আছে।

বহুক্ষণ বাদে মঙ্গল ঘোষ তাঁর বইয়ের দিকে চোখ রেখে গলা-খাটো করে বললেন, অতীত আছে, খোঁজ করে দেখতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কার ?

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন একবার। চোখের তারায় কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিল। ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল থেকে আপনি কার কথা ভাবছেন ?

জবাব না দিয়ে আমিও হাসি মুখেই চেয়ে রইলাম। যা বোঝে বুঝুক। স্মৃতিকণাকে নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের চিন্তার মধ্যে দৈন্ত

ছিল বলেই এই মানুষ যেন আরো বেশি টানছে আমাকে। সত্যি যদি সমস্ত রাত কাটানোর পর কাল কোনো এক সময় রামেশ্বরে এসে হাজির হত দুজনে নিজেই আমি সকল সংশয়ের কত উর্ধ্বে উঠতে পারতুম? ওরা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত ও-রকম অস্বস্তিতে মন ছেয়ে ছিল কেন? নিজেই যেন ভারী একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি এখন।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, আপনার স্মৃতিকণা মীনাক্ষী মন্দিরের এক নিরিবিলি কোণে হাজার স্তম্ভের একটাতে ঠেস দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল—যারা দেখছিল ভাবছিল ধ্যানে বসে আছে।

আমি অবাক, ঘুমুচ্ছিল!

—হ্যাঁ, সমস্ত দিন উপোসের পর এমন গাঢ় ঘুম যে ডেকে সাড়া পাইনি, ঘুম ভাঙানোর জন্য গায়ে হাত দিতে হয়েছে।

রামেশ্বরে এসেও মনে হল মেয়েটা যেন বদলেই গেছে হঠাৎ। আগেও ধীর ঠাণ্ডাই দেখেছি, কিন্তু এখন যেন নিজের মধ্যে ডুবে আছে একেবারে। মন্দির দেখলাম সমুদ্র দেখলাম আবার ওকেও দেখলাম।···সমুদ্রে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে মন্দিরে গেল, মন্দিরের বাইশ কুণ্ডের প্রতিটির জল মাথায় ঢালল তারপর ডালি হাতে পুজো দিতে গেল। তখনো আমি বিগ্রহ দেখেছি আর সেই সঙ্গে স্মৃতিকণাকেও দেখেছি। এমন একাগ্র কমনীয় মুখ আর দুটি চোখে পড়েনি সেখানে। ও যেন নিজেরই ভিতরের কোনো এক আবদ্ধ গণ্ডীর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এখানকার বিশাল মন্দিরের মহিমা আর সমুদ্রের বিশেষ রূপটুকু বাদ দিলে বাকি সড়কগুলো যেন সেকালের পাতায় আটকে আছে। রামেশ্বরের কোথাও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এবড়ো খেবড়ো অপরিসর রাস্তাগুলোয় রাজ্যের ধুলো। আর রোদে পোড়া সাধারণ মানুষগুলোও যেন একালের খবর খুব রাখে না।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মঙ্গল ঘোষ ট্রেন ছেড়ে নড়েননি। বলেছেন আপনার সখ থাকে তো ধুলো খানগে যান, আমার সব দেখা আছে।

সবই তো দেখা আছে, তবু এই লোক কেন এ-ভাবে ঘুরছেন সেটাই আশ্চর্য। টাঙ্গাঅলার ইচ্ছেয় মাইল তিনেক দূরের যে স্থান মাহাত্ম্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তার নাম শুনলাম রাম ঝরুক্কা। টাঙ্গাঅলার মুখে শব্দটা বোধগম্য হতে সময় লেগেছিল।

নির্জন একটা উঁচু টিলার ওপর ছোট মন্দির। নিচের বাঁধানো ফলকের লেখা পড়ে বোঝা গেল কোথায় এসেছি। রামজী রুক্‌কার অপভ্রংশ রাম ঝরুক্কা। অর্থাৎ রামজী সীতার খোঁজে এসে এখানে রুখে ছিলেন। ওই মন্দিরে তাঁর বাঁধানো পদচিহ্ন। ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি সামনের সমুদ্র ছাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন ওপারের লঙ্কার দিকে—যেখানে রাবণের হাতে সীতা বন্দিনী।

নিচের সমুদ্র যেন চাঁদোয়া আকারে এই মন্দিরটিকে বেষ্টন করে আছে। মন্দিরের চারদিকে লোহার রেলিং ঘেরা অপরিসর চত্বর। এটা পুণ্যস্থান কতটুকু জানি না, কিন্তু এই নির্জন চত্বরে বসে সমুদ্র দেখার মতো একটা স্থান বটে।

রেলিং ঘেঁষে বসে একজন তাই দেখছে।

—স্মৃতিকণা।

আমার সাড়া পেয়ে এমন চমকে উঠল যে আমি নিজেই অপ্রস্তুত। জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ এসেছ?

—ঘণ্টাখানেক আগে। বসুন।

—আমি বসলে তোমার অসুবিধে হবে না?

মুখ তুলে তাকালো।—আমার অসুবিধে কি?

—সেই মাদুরা থেকে দেখছি তুমি একলা ঘোরা ফেরা করছ আর কিছু একটা বিশেষ ভাবনা নিয়ে রয়েছো···তাই বলছিলাম।

আগের কথার জবাব দিল না। সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালো আবার। বলল, বসুন—

পাশে বসলাম। হাওয়ার ছড়াছড়ি এখানে। বাতাসে ধুতি পাঞ্জাবি ঠিক রাখা দায়। মেয়েটা শাড়ির আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসে আছে, কিন্তু সামনের চুল উড়ছে, মুহর্মুহু চোখে মুখে এসে পড়ছে। হাতে করে কতবার সরাবে। সে চেষ্টা করছে না।

বললাম, টাঙ্গাঅলার মুখে না শুনলে এ-রকম একটা জায়গা আছে এখানে জানতেই পেতাম না।···তুমি একলা চলে এসেছ এ-সব জায়গা তোমার ভালই চেনা জানা তাহলে ?

—বছর কয়েক আগে এসেছিলাম। কিছুদিন ছিলামও।

—তুমি একলা এসেছিলে ?

আস্তে আস্তে আমার দিকে মুখ ফেরালো। চোখের সামনে থেকে অবাধ্য চুলের গোছা সরাতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা নাড়ল, না। একলা আসি নি।

স্মৃতিকণার গল্প মঙ্গল ঘোষের কাছে করেছিলাম উটিতে এসে। পাহাড়ের মাথায় মস্ত লেক। স্বচ্ছ টলটলে নীল জল। দলসুদ্ধু লোক সেখানে হৈ হুল্লোড় করছে। অনেকে স-কলরবে নৌকো বাইছে অনেকে স্টিম বোটে চেপে বসেছে। ওদের সঙ্গে স্মৃতিকণাও আছে। হাসি-খুশি মুখ। মঙ্গল ঘোষ সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ওই মেয়ের অতীতের কোনো হদিস পেলেন ?

—কেন বলুন তো ?

—রামেশ্বর ছেড়ে আসার পর থেকেই অন্য রকম দেখছি আবার। মাদুরা আর রামেশ্বর—এই দুটো জায়গায় মস্ত একটা শোকের বোঝা ফেলে এসে এখন যেন আগের থেকেও বেশি তরতাজা হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোকের পর্যবেক্ষণ মিথ্যে নয় খুব। মেয়েটা আগে আরো কত হাসি-খুশি ছিল এই মুখ দেখে আঁচ করতে পারি। রামেশ্বর ছেড়ে আসার পর থেকে ও যেন অনেকখানি হালকা হতে পেরেছে। বললাম, শোকের বোঝা ফেলে এসেছে কি শোকের অহংকার আরো একটু শক্তপোক্ত করে নিয়ে এসেছে ঠিক বুঝছি না।

—তার মানে ?

—তার মানে আমার মনে হয় ওই হাসি-খুশির মেয়াদ খুব বেশি দিনের নয়—এটুকু ওর সাময়িক উপার্জন।

মঙ্গল ঘোষ এবারে আমাকেই ভালো করে দেখে নিলেন এক দফা। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মনে হয় ?

বললাম, প্রত্যেক মানুষেরই তৃপ্তি বা খুশির পিছনে একটা জোগানদারির উৎস থাকে—স্মৃতিকণার তা নেই। এখন যে খুশির ভাবটুকু দেখছেন সেটা ও নিজের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করছে। ওতে টান পড়ে গেলে আবার না ডবল হতাশার মধ্যে ডুবতে হয়।

মঙ্গল ঘোষ লেকের মোটর বোটের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন আবার। লেকের জলে চক্রাকারে ঘুরছে ওটা। স্মৃতিকণা হাসছে, তার গা ঘেঁসে বসে লিডার দ্বিজু মল্লিক হাসছেন, অন্য সকলেরও হাসি মুখ।

মঙ্গল ঘোষ আমার দিকেই ফিরলেন আবার। চাউনিটা গভীর। আলো ঝলমল এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রকৃতি এক নিখাদ আনন্দের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সেই আনন্দ ধারায় অবগাহন করছে সকলে। এর মধ্যে শুধু ওই মেয়ের আনন্দটুকুই সত্যি নয় এ-কথা ভাবতেও যেন বুকের তলায় মোচড় পড়ছে ভদ্রলোকের। নির্বাক, কিন্তু উন্মুখ।

রামেশ্বরে সমুদ্রের ধারে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আঁকা সেই ছোট মন্দিরের নির্জন চাতালে বসে শান্ত নির্লিপ্ত মুখে স্মৃতিকণা নিজের জীবনের যেটুকু ব্যক্ত করেছিল সেই চিত্রটাই সাদামাটাভাবে তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলাম। শোনার পর এই মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় কেন যেন আমার সেটুকু দেখার লোভ ছিল।

পুরুষ বা রমণীর এর থেকে ঢের বেশি বেদনার খবর আমার জানা আছে বা দেখা আছে। বন্ধনের বল্গা ছেঁড়ার অকরুণ ঘটনা হামেশাই ঘটছে। স্মৃতিকণা তার শোক মেনে নিয়েছে। কিন্তু উত্তরণের যে মহিমাটুকু সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে এখন, সেটা আরো বড় ট্র্যাজেডি কিনা আমার জানা নেই।

সেই চিরাচরিত গল্প—সাধারণ ঘরের একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটির টাকার জোর নেই, রূপের জোর নেই। খুব সাধারণ একটুখানি শ্রী আছে শুধু। এই মেয়ে স্মৃতিকণা। ছেলেটির

আরো দৈন্য দশা। উনোনের হাঁড়িতে জল তো বাজারে চাল—এই হাল তার। ছেলেটির চেহারাপত্র ভালো কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে তার অনেকখানি বিবর্ণ। সেই ছেলে প্রকাশ চাটুজ্জে।

ছেলেটা বলত, এই নাম মিথ্যে হবে না, একদিন প্রকাশ চাটুজ্জের প্রকাশখানা কেমন হয় দেখে চক্ষু ঠিকরে যাবে তোমার।

স্মৃতিকণা বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করতে ভালো লাগত।

দুজনেই গান গাইত, গান শিখত। আর স্বপ্ন দেখত। সেদিনের সেই দারিদ্র্য যেন আগামী দিনের সুন্দরের ওপর ভস্মাবরণ একটা। এ সরে যেতে বাধ্য।

জল্পনা কল্পনায় বিভোর হত দুজনে। স্মৃতিকণার বরাবরকার ইচ্ছে সুন্দর একটা গানের স্কুল হবে দুজনের। ছোট থেকে বড় কত ছেলে আর কত মেয়ে গানের হাট বসিয়ে দেবে সেখানে। প্রকাশ চাটুজ্জে বলত, দূর তা কেন, নামজাদা আর্টিস্ট হব দুজনে, লাখ লাখ টাকা রোজগার করব, আর নির্জলা আনন্দে ভাসব তোমাকে নিয়ে।

স্মৃতিকণা বলত, তুমি বড় স্বার্থপর।

প্রকাশ জবাব দিত, তোমার জন্য আমি স্বার্থপরচূড়ামণি।

গানের নৌকোয় আর স্বপ্নের নৌকোয় ভেসে চলেছিল দুজনে। বাস্তবে দুজনারই তখন গানের মাস্টারি ভরসা। তবে এরই মধ্যে প্রকাশ চাটুজ্জে টাকার মুখ দেখছে এক এক সময়। তার দুচারখানা গান সিনেমায় লাগছে। দুই একখানা রেকর্ডও বাজারে ভালো চালু হয়েছে। আর এই সার্থকতার সবটুকু আনন্দ যেন স্মৃতিকণার। বলত, খবরদার টাকা ওড়াবে না, আমাদের গানের স্কুল হবে।

প্রকাশ বলত, আমাদের গানের স্কুলে তোমার আর আমার ভিন্ন তৃতীয় কারো জায়গা হবে না।

প্রকাশ চাটুজ্জের ধৈর্য বলে কিছু নেই। সুদিনের সামান্য মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের তাগিদ। তার সবুর সয়নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কম করে ঘণ্টা বারো এত কাছাকাছি থেকেও নিজেকে কত

আর আগলে রাখবে স্মৃতিকণা। তাছাড়া বিয়ের সাধ তো তারও তলায় তলায় কম নয়। স্বপ্নে বিভোর মানুষটা যেভাবে তাকে সাহস জুগিয়েছে স্মৃতিকণার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আপনি গেছে।

বিয়ে হয়ে গেছে। আর তারপরেই ওই মানুষ আরো বেপরোয়া আরো দিলদরিয়া। বিয়ের পরেই আরো কিছু কাঁচা টাকা হাতে এসেছে প্রকাশ চাটুজ্জের। সিনেমায় আবার খানতিনেক গানের প্লে-ব্যাকের টাকা আর রেকর্ডের টাকা। বিয়ের অজুহাত দেখিয়ে সে-সব টাকার আগাম দখল নিয়েই প্রস্তাব করেছে, হনিমুনে বেরুবে। স্মৃতিকণা বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, এভাবে খরচ করলে আমাদের গানের স্কুল হবে কি করে?

কিন্তু প্রকাশ চাটুজ্জের ভিতরখানা ফুলেফেঁপে দশখানা তখন। বলেছে, হবে হবে, ভাগ্যের চাকা একবার ঘুরতে শুরু করলে বনবন করে ঘোরে—এখন সব হবে তুমি দেখে নিও।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর বেড়াবার দুটি জায়গা বেছে নিয়েছিল স্মৃতিকণা। এক রামেশ্বর সেতুবন্ধ। দুই—সেখান থেকে মাদুরা। এই দুটো জায়গার প্রতি একটা মানসিক টান ছিল স্মৃতিকণার। কারণ, তার মায়ের গুরুদেব শেষ জীবনে এই দু জায়গায় কাটিয়ে গেছেন। গুরুদেবের সঙ্গে তার মা-ও একবার রামেশ্বর আর মাদুরায় এসেছিল। ছেলেবেলায় মায়ের মুখে এই দু জায়গার অনেক গল্প শুনেছে।

প্রথমে রামেশ্বরে এসেছিল। কিন্তু আসার পথেই কিছুটা উদবেগের কারণ ঘটেছিল স্মৃতিকণার। আগেও মাঝে সাজে প্রকাশ চাটুজ্জে পেটে কি একটা ব্যথার কথা বলত। কিন্তু খুব একটা গা করতে চাইত না। বলত, পকেটে পয়সা না থাকলে উপোস দিয়েছি, আর থাকলে চপ কাটলেট খেয়েছি—এই অনিয়মের ফল ভোগ করতে হয় একটু আধটু, ও কিছু না। স্মৃতিকণার তাড়ায় ছোটখাট ডাক্তার দেখানো হয়েছে, তার ওষুধে হোক বা আপনা

থেকে হোক ব্যথা চাপা পড়েছে। কখনো সখনো সামান্য ব্যথা হলেও স্মৃতিকণাকে সেটা জানতে দেয়নি।

রামেশ্বরে পা দেবার আগেই ব্যথার উৎপাতটা বাড়ছিল। রামেশ্বরে ভালো ডাক্তার মিলবে কিনা স্মৃতিকণা সেই চিন্তায় পড়েছিল তখন। কিন্তু রামেশ্বরে পৌঁছে ব্যথা বেদনা যেন বেমালুম ভুলেই গেল প্রকাশ চাটুজ্জে। ঠাট্টার সুরে বলেছে, স্থান মাহাত্ম্যে সব ঠিক হয়ে গেছে, ডাক্তার বদ্যির দরকার নেই।

রামেশ্বরে দরকার হয়নি। ক'টা দিন সমুদ্রের ধারে ধারে আর আকাশে বাতাসে যেন ডানা মেলে কাটিয়েছে দুজনে। সুখ ওই সমুদ্রের মতোই বুকের কূলে কূলে উচ্ছল হয়ে উঠেছে বুঝি।

কিন্তু সেখান থেকে মাদুরায় এসে পা ফেলার দুদিনের মধ্যে আচমকা সে এক চরম অবস্থা প্রকাশ চাটুজ্জের। পেটের ব্যথায় সর্বাঙ্গ বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল। যন্ত্রণায় বিবর্ণ সমস্ত মুখ। ভয়ে ত্রাসে স্মৃতিকণা কাঠ। সেই বিপদের সময়ে কে অত বল জুগিয়েছে জানে না। অজানা অচেনা লোকের সাহায্যে ডাক্তার এনেছে, তার নির্দেশে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ চাটুজ্জেকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার জানিয়েছে, গল ব্লাডারের ব্যথা ওটা, অবস্থা সুবিধের নয়। গল ব্লাডার কি ব্যাপার স্মৃতিকণার ধারণা নেই, কিন্তু অবস্থা যে সুবিধের নয় সেটা সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে বুঝতে পারছে। প্রকাশ চাটুজ্জের সমস্ত মুখে যেন ভয়ঙ্কর হলদে ছাপ দেখছে একটা। তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান সে। তাকে হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে স্মৃতিকণা তাকে নিয়ে যেতে দেখেছে। সে সেদিকে পা বাড়াতে বাধা পড়েছে।

সম্বিত ফিরতে স্মৃতিকণা পাগলের মতোই ছুটে এসেছিল মীনাক্ষী মন্দিরে···।

আগের দিন দুজনে এসেছিল। পাণ্ডার মুখে সুন্দরেশ্বরের সঙ্গে

দেবী মীনাক্ষীর বিয়ের গল্প শুনেছিল। দু'চোখ ভরে পার্বতীর বধূ-রূপ দেখেছিল।

সেই মন্দিরে ছুটে এসে পরদিন স্মৃতিকণা প্রার্থনায় ভেঙে পড়েছে। না, এ-রকম আকুল প্রার্থনা সে জীবনে করে নি। কোথা দিয়ে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে টেরও পায় নি। নিয়মিত উপোসে দিন কেটেছে। কেবল একটি মাত্র প্রার্থনা উত্তাল হয়ে দেবীর চরণে অবিরাম আছড়ে পড়েছে। মা-গো, ওকে তুমি কেড়ে নিও না—তোমার কপালে সিঁদুর সিঁথিতে সিঁদুর ওকে তুমি কেড়ে নিতে পারো না—পারো না পারো না।

চাতালে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে উঠতে চমক ভেঙেছে। আবার ছুটেছে হাসপাতালে। কিন্তু ও যেন তখন মনে মনে জানে বিপদ হবে না, বিপদ হতে পারে না।

...হ্যাঁ, হাসপাতালে এসে সুখবরই পেয়েছে। ডাক্তারের মুখে শুনেছে খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই রোগীর অবস্থা দুপুরের পর থেকে বশে এসেছে। সে এখন অনেকখানি সুস্থ। তবে গল ব্লাডারের ব্যাপার, দিনকয়েক এখানে অবজারভেশনে রেখে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সাবধানে চিকিৎসা করা দরকার।

স্মৃতিকণা কেবিনে ঢুকতে বড় বড় চোখ করে প্রকাশ চাটুজ্জে তার শুকনো মুখখানা দেখেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, সমস্ত দিন তুমি ছিলে কোথায়?

একটা আনন্দের কান্না বুক ঠেলে গলা বেয়ে উঠতে চেয়েছে। চকচকে দু'চোখ মেলে স্মৃতিকণা তাকে দেখেছে শুধু। কোথায় ছিল বলতে পারেনি। বলে নি।

কলকাতায় ফিরে আসার পরে স্মৃতিকণার তাগিদে পড়ে প্রকাশ চাটুজ্জে চিকিৎসা কিছু করিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা খুব জোরালো রকমের কিছু নয়। সে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অতটা গা করেনি। ভিতরে ভিতরে স্মৃতিকণাও প্রায় নিশ্চিন্ত। তার স্থির বিশ্বাস,

চিকিৎসা যেটুকু দরকার স্বয়ং বিপদ-নাশিনী তা করে রেখেছেন, নতুন করে আর কোনো বিপদ হতে পারে না।

…কিন্তু বছর না ঘুরতে বিপদ যেদিক থেকে এসেছে স্মৃতিকণার মনের কোণে তার ছায়ামাত্র ছিল না। হঠাৎই যেন কিছু একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছিল সে। মানুষটার সরলতা কমে আসছে, চোখ মুখের সহজ হাসি-খুশি ভাব কমে আসছে। নিয়মিত তার দেখা মেলে না, রাতেও এক একদিন ঘরে ফেরে না। জিজ্ঞাসা করলে কাজের অজুহাত দেখায়—কোথায় কোন জলসায় রাত কাবার হয়ে গেছে সেই ফিরিস্তি শোনায়।

কৈফিয়তের বদলে ক্রমে বিরক্তির ছায়া দেখা যেতে লাগল প্রকাশ চাটুজ্জের মুখে। অনিয়ম বাড়তেই থাকল। রোজগারও বাড়ছে টের পায় স্মৃতিকণা, বেশবাসের চাকচিক্য চোখে পড়ে, কিন্তু স্মৃতিকণার হাতে দরকারের টাকাও আসে না।

জিজ্ঞাসাবাদের আগে একদিন শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়েই সর্বনাশের হদিস পেয়েছে স্মৃতিকণা। ওই লোকের জীবনে দ্বিতীয় রমণী এসেছে। জেরার মুখে প্রকাশ চাটুজ্জে এক রকম পালিয়েই গেছে। পরে সেই মেয়েকে স্বচক্ষেই দেখেছে স্মৃতিকণা। সিনেমার কোনো ভাবী তারকা। তার থেকে রূপের চটক ঢের ঢের বেশি, পয়সার জোরও কম নয়।

ঘৃণায় বিদ্বেষে নিঃশব্দে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে স্মৃতিকণা। প্রকাশ চাটুজ্জেও তাই চেয়েছিল। ক'মাস না যেতে ডিভোর্সের সূচনা হিসেবে কোর্টে জুডিসিয়াল সেপারেশনের আবেদন পেশ করেছে সে। প্রতিবাদিনীর সাড়া না পেয়ে এক তরফা সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আর তার দু'বছর বাদে তেমনি একতরফা ডিভোর্সও সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিনেমার পত্রপত্রিকায় সেই নবতারকার সঙ্গে প্রকাশ চাটুজ্জের বিয়ের খবর আর নবদম্পতির ছবিও চোখে পড়েছে তার।

স্মৃতিকণার মনের ওপরে তখনো ঘৃণার পাহাড়ের বোঝা শুধু।

আরো দুটো বছর এই দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে সে। তারপর গানের স্কুলের এক সহকর্মিণী বান্ধবীর মুখে একটা খবর শুনে সেই বোঝা নড়েচড়ে উঠেছে। সিনেমা রাজ্যের যাবতীয় খবর সেই বান্ধবীর ঠোঁটের ডগায়। কারণ প্লে-ব্যাকের জন্য ওই রাজ্য থেকে তারও মাঝে সাজে ডাক আসে। সে ওকে জানিয়েছে প্রকাশ চাটুজ্জে এখন হাসপাতালে, গল ব্লাডারের সীরিয়াস অসুখ, মরণ-বাঁচন সমস্যা—এরই মধ্যে তার চিত্রতারকা বউ নিশ্চিন্তমনে শূটিং করে বেড়াচ্ছে।

শোনার পর থেকে ভিতরে ভিতরে কি যে কাণ্ড হতে লাগল স্মৃতিকণার, জানে না। সমস্ত দিন ছটফট করে কাটিয়ে বিকেলে হাসপাতালে এলো।···চিত্রতারকা বউ নামী হাসপাতালের দামী কেবিনেই রেখেছে তাকে। স্মৃতিকণা ঠাণ্ডামুখে ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে প্রকাশ চাটুজ্জের যন্ত্রণাকাতর বিবর্ণ মুখ আরো বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনের বেশির ভাগ সময় মরফিন দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হচ্ছিল তাকে। সেই ঘোর সবে কেটেছিল। মুখ ফেরানোর জন্য তাড়াতাড়ি পাশ ফিরতে গিয়ে অস্ফুট একটা কাতরোক্তি বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।

ঘুরে আবার তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল স্মৃতিকণা। দেখল। কঙ্কালসার দেহ শয্যায় মিশে আছে। তার শিয়রে মৃত্যুর ছায়া দাঁড়িয়ে বুঝি। কালিপড়া চোখের কোণে জল। বুকের তলার সেই অনড় ঘৃণার পাহাড়ের বোঝা থেকে মুক্তি কাম্য স্মৃতিকণারও। ও তাকে ক্ষমা করবে। ক্ষমা করে প্রতিহিংসা নেবে। চোখে চোখ রেখে বলল, ভয় কি, ভালো হয়ে যাবে।

ক'টা দিন ক'টা রাত ছটফট করে কেটেছে এরপর। শেষে মনস্থির করে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এই পথে বেরিয়ে পড়েছে। মীনাক্ষী মন্দিরের পথে।

…আগের বারের মতোই নিরম্বু উপবাসে মন্দিরের সেই চাতালের কোণে প্রার্থনায় বসেছিল। একাগ্র মনে প্রার্থনা করছিলও। কিন্তু আশ্চর্য, প্রার্থনা করতে করতে এবারে এখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

…মঙ্গল ঘোষের হ্যাঁচকা টানে সেই ঘুম ভেঙেছে। তার প্রার্থনা দেবীর কানে পৌঁছেছে কিনা জানে না। প্রকাশ চাটুজ্জে সত্যিই আবার জীবন ফিরে পাবে কি পাবে না জানে না। কিন্তু বুকের তলা থেকে ঘৃণার পাহাড় সরে গেছে, উবে গেছে। অদ্ভুত হাল্কা বোধ করেছে, প্রশান্তিতে ভিতরটা যেন ভরে গেছে।

লেকের মোটর বোট ঘাটে এসে লেগেছে। খুশির হুল্লোড় তুলে নামছে সকলে। বোটটা জোরেই দুলে দুলে উঠছে। স্মৃতিকণাও হাসি মুখেই নামছে। হাত ধরে দ্বিজেন মল্লিক সাহায্য করছেন তাকে। ঠিক তক্ষুনি স্মৃতিকণা এদিক ওদিক তাকালো, দূরে আমাদের দিকে চোখও পড়ল তার। আমার দিকে ঠিক নয়, মঙ্গল ঘোষের দিকে। মনে হল কালো মুখে সুচারু লজ্জার ছোঁয়া দেখলাম একটু।

স্মৃতিকণা মাটিতে নেমে আসার পর মঙ্গল ঘোষ আমার দিকে ফিরলেন। ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন একটু। বললেন, আপনার ওপর আমার রাগ হচ্ছে, মেয়েটার এই হালকা হতে পারার মিয়াদটুকুও বেশি নয় ভাবছেন কেন?

হেসে জবাব দিলাম, রাগের কি আছে, আপনি অন্যরকম ভাবুন।

তেমনি আধা রাগত সুরেই মঙ্গল ঘোষ বললেন, ভাবা যাচ্ছে না।

—না মশাই, আমি কোনো অনুতাপের মধ্যে বাস করছি না। বরং তার উলটো। একজনের অনুতাপ দেখব বলে বারোটা বছর অপেক্ষা করে আছি।'

কলকাতা থেকে মাদ্রাজ আসার পথে মঙ্গল ঘোষ বলেছিলেন কথাগুলো। আর অবাক বিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম খুনের দায়ে সাড়ে ন'বছর জেল খাটার পর এই আড়াই বছর ধরে সেই একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিনা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, না—বারো বছরের মিয়াদ ফুরোলে তাঁর দেখা মেলার কথা। ফুরিয়েছে। দেখা যাক—

মনে আছে, জবাবটা দিয়ে হাসিভরা ত্ব'চোখ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ফিরিয়েছিলেন তিনি। আর সন্তপরিচয়ের সেই নির্বাক বিস্ময়ে আমি ভাবছিলাম খুনী মানুষের মুখ এত সুন্দর হয় কি করে, চোখ এত সুন্দর হয় কি করে, হাসি এত সুন্দর হয় কি করে?

সেই থেকে আমি নিঃসংশয় ছিলাম, বারো বছর বাদে যাঁর দেখা মেলার কথা তিনি অবশ্যই কোনো রমণী। তারপর থেকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এতদিন ধরে এত জায়গায় ঘোরাফেরার পরেও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল বেড়েছে বই একটুও কমেনি। আমার কেবলই মনে হত ভদ্রলোক যেন জানেন কোথায় গেলে সেই মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। কিন্তু ভ্রমণসূচীর প্রায় শেষ পর্যায়ে উপস্থিত আমরা, এখন পর্যন্ত এই মানুষের চোখে মুখে এতটুকু বাড়তি উত্তেজনা লক্ষ্য করিনি।

আমার ধৈর্যের অবসান ঘটল। একটা উপলক্ষ ধরে ভদ্রলোকের

সেই প্রত্যাশিত উত্তেজনা বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতার ফলে যেটুকু বোঝার সেটুকু যেন পলকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। …স্মৃতিকণার যেমন লক্ষ্যস্থল ছিল মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির মঙ্গল ঘোষেরও তেমনি একমাত্র লক্ষ্য অন্ধ্রের তিরুমালাই তিরুপতি।

এক রাজনৈতিক দুর্যোগের ফলে আমাদের নির্ধারিত ভ্রমণসূচী থেকে অন্ধ্র রাজ্যে প্রবেশ বাতিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে যেন অবুঝ ভিন্ন মানুষ মঙ্গল ঘোষ। প্রথমে ম্যানেজারের ওপরেই অকরুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

ব্যাপারটা খুব আকস্মিক নয়। তামিলনাড়ু আর কেরালার পথে পথেই অন্ধ্ররাজ্যে রাজনৈতিক গোলযোগের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল আমাদের কাছে। অন্ধ্রবাসীদের জন্য অন্ধ্র—অন্ধ্র ফর অন্ধ্রজ—তেলেঙ্গানার সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করে বিছিন্ন অন্ধ্ররাজ্য পত্তনের জিগির পুষ্ট হয়ে উঠছিল। সেখানে প্রবেশের আগেই নানা জায়গায় ছাত্ররা আমাদের গাড়িতে উঠে একরকম জোর করেই চাঁদা আদায় করে নিয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীর জোরালো হস্তক্ষেপ তখনো নেমে আসেনি।

মহীশূর ঘুরে আমাদের অন্ধ্রের রেনিগুণ্টায় পৌঁছানোর কথা। সেখান থেকে সাত পাহাড়ের শেষের চূড়ায় ভারতের অনন্য জাগ্রত দেবস্থান তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বরের বিস্তৃত এলাকা।

মহীশূর স্টেট ছাড়ার আগেই শোনা গেল অন্ধ্রের গোলযোগ প্রকট হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক। সন্ত্রাসের আশঙ্কায় অনেক জায়গায় এমন কি অনেক ট্রেনে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। নানা জায়গা থেকে ছোটখাট অঘটনের খবর কানে আসছে। সমস্ত অন্ধ্র উত্তপ্ত এখন।

আমরা তখন মহীশূর রাজ্যের কোলার-এ বসে। কোলার অন্ধ্রের গায়ে। এ অবস্থায় কোলার থেকেই ফেরার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন দলের ম্যানেজার। শোনামাত্র সমস্ত দলের মধ্যে একমাত্র

মঙ্গল ঘোষই ক্ষেপে গেলেন যেন। চোখ মুখ লাল করে ম্যানেজারের ওপর চড়াও হলেন তিনি, কেন যাওয়া হবে না? একি আপনার ইচ্ছেমতো নাকি? ট্রেন চলাচল যখন বন্ধ হয়নি তখন আপনি দল নিয়ে যাবেন না বলার কে?

ম্যানেজার ধৈর্য ধরেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করল তাঁকে। ফলে আরো বেশি অসহিষ্ণু তিনি। এক কথা তার, প্রোগ্রামে যখন আছে যেতে হবে। প্রোগ্রাম বাতিল করার মতো সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায় নি।

আমি জানি, বিপদ বুঝলে প্রোগ্রাম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেবার বিধিগত পরোয়ানা ম্যানেজারের আছে। তাছাড়া ছিয়াত্তর জনের প্রায় সমস্ত দলটিই তার পিছনে। নানা রকম গুজব ছড়ানোর ফলে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দ করতে এসে সাধ করে কে অজানা স্থানের অশান্তির মধ্যে পড়তে চায়।

পরিস্থিতি বুঝে মঙ্গল ঘোষ গুম খানিকক্ষণ। থমথমে মুখ। তাঁকে বোঝাতে এসে দলনেতা দ্বিজেন মল্লিক হু'চোখের একটা বিরক্তির ঝাপটা খেয়ে সরে গেলেন।

খানিক নিশ্চল বসে থেকে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মঙ্গল ঘোষ। ওপরের বাঙ্ক থেকে হ্যাঁচকা টানে নিজের হোল্ড-অল মাটিতে নামিয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর স্যুটকেশ আর হোল্ড-অল নিয়ে সোজা গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আমার দিকেও একবার তাকালেন না বা একটি কথা বললেন না।

কামরার সব ক'টি যাত্রী জানালায় ঝুঁকেছে। রাত সাড়ে দশটা হবে তখন। স্টেশনের এ-দিকটা ফাঁকা।

মিনিট ছুই তিন বাদে গাড়ি থেকে নামলাম আমিও। হন হন করে মানুষটা তখন শ'খানেক গজ এগিয়ে গেছেন। এক সারি ওয়েটিং রুম আছে ও-দিকে।

ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরব কি না ভেবে পাচ্ছিলাম না। পাশে

তাকিয়ে দেখি স্মৃতিকণাও নেমে এসেছে। বলল, ভদ্রলোক একাই তিরুপতি চলে যাবেন মনে হচ্ছে।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

খানিক বাদেই ওই মানুষকে আর দেখা গেল না। রাতের মতো কোনো একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্মৃতিকণাকে বললাম, একবার দেখে আসি—

স্মৃতিকণা যেন তাই চাইছিল। বলল, চলুন আমিও যাই।

বাধা দিলাম না। ওর চোখে মুখে স্পষ্ট উদ্বেগ। ভিতরে ভিতরে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য সকলেই বোধ করেছে বোধহয়। এতদিন ধরে এক সঙ্গে থাকা আর ওঠা বসা চলা ফেরার ফাঁক দিয়ে এই সবল মানুষটি সকলেরই মন জুড়ে বসে আছেন অনেকখানি। ফেরার পালায় এই একজন সঙ্গে থাকবেন না সেটা কারো কাম্য নয়। স্মৃতিকণা মুখে কখনো বলেনি, কিন্তু এই লোকের প্রতি তার একটু বাড়তি কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। মাদুরার সেই বিড়ম্বনার পরিস্থিতি ভোলার কথা নয়। ছিয়াত্তরজন যাত্রীর মধ্যে ওই একজনই ছোটাছুটি করে সব-দিক রক্ষা করেছে। তাছাড়া লিডার দ্বিজু মল্লিকের সঙ্গ এড়ানোর পর থেকে মঙ্গল ঘোষকে ও-ই অন্য সকলের থেকে বেশি জানার সুযোগ পেয়েছে।

ভদ্রলোকের রুচি জানি। ছ'পাশের ঘর ছেড়ে মাঝের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের ভিতরে গলা বাড়িয়ে দেখি, সুটকেশ আর হোল্ড-অল টেবিলের ওপর রেখে পাশের ডেক-চেয়ারে গা ছেড়ে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে নয়, পিছনে স্মৃতিকণাকে দেখে আস্তে আস্তে সোজা হলেন। গম্ভীর মুখ। চাউনিটা এত গম্ভীর যে হঠাৎ কি বলব ভেবে পেলাম না। আমাকেই বললেন, ফেরার তাগিদ দেবার জন্যে নাকি?

সেটা নিষ্ফল হবে জানা কথাই। মাথা নাড়লাম।—না, দেখতে এলাম, রাতে তো আর নড়ছেন না?

উনি জবাব দিলেন, সকালে ট্রেন আছে কিনা জানি না, না থাকলে একটা ট্যাক্সি করে চলে যাব।

স্মৃতিকণা বলল, আমাদের খুব বিচ্ছিরি লাগছে, সকলে একসঙ্গে এসেছি একসঙ্গে ফিরতাম—

গভীর চাউনিটা স্মৃতিকণার মুখের ওপর এসে আটকালো। তারপর অটুট গাম্ভীর্যে একটু ফাটল ধরল বোধহয়। গলার স্বরও কোমল শোনালো। বললেন, আমার যাওয়া দরকার, তাছাড়া একসঙ্গে ফেরা এমনিতেও হত না। দু'চোখ স্মৃতিকণার মুখের ওপর কিন্তু চাউনিটা যেন আরো নরম। বললেন, তুমি এসেছ দিদি ভালই হয়েছে, ক'দিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলে রাখব ভাবছিলাম, এই গণ্ডগোলে পড়ে ভুল হয়ে গেছল—

বয়েসে স্মৃতিকণা অনেক ছোট হলেও এই প্রথম এ-রকম অন্তরঙ্গ সম্বোধন। এতদিন 'আপনি' করে বলেছেন। আজ এই ডাক শুনতে ভালো লেগেছে হয়তো। কিন্তু স্মৃতিকণাও অবাক একটু।

পকেটের মোটা ব্যাগটা বার করে মঙ্গল ঘোষ তার মধ্যে কি খুঁজতে লাগলেন। পেলেন। কার্ড একটা। স্মৃতিকণার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এটা রাখ তোমার কাছে—

কিছু না বুঝেই স্মৃতিকণা সেটা হাতে নিল। মঙ্গল ঘোষ বললেন, কলকাতায় পৌঁছনোর দিন পনের বাদে বাঁকড়োর ওই ঠিকানায় আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরো—আমি তার আগেই ফিরে যাব। তোমার সুবিধে মতো অবশ্য এসো একদিন।

এ-রকম আমন্ত্রণের তাৎপর্যটুকুও কান পেতে শোনার মতো। খুব নরম অথচ নির্লিপ্ত ভারি গলায় মঙ্গল ঘোষ বলে গেলেন, আমার হেপাজতে পিতৃদত্ত একরাশ জঞ্জাল জমে আছে—অনেক টাকা—তার একটা পয়সাও এ-পর্যন্ত কোনো ভালো কাজে লাগেনি। তুমি গানের স্কুল করবে, মনের মতো নিজের গানের স্কুল—টাকার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।

স্মৃতিকণা বিমূঢ়ের মতো চেয়ে আছে তাঁর দিকে। কি শুনছে বা ঠিক শুনছে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না যেন। মঙ্গল ঘোষ আবার বললেন, তুমি মনে কোনো দ্বিধা রেখো না, আর একটা কথা মনে রেখো বোন, লাইফ ইজ্ অলওয়েজ ওয়ার্থলিভিং। ইউ ডিজার্ভ এভরিথিং বিকজ ইউ আর ব্রেভ—এর মধ্যে দয়ামায়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

স্মৃতিকণা সচকিত এবার। পাশে একবার আমাকে দেখে নিল। অর্থাৎ এই লোকের কাছে আমি ওর কোনো কথা গোপন রাখি নি বুঝেছে। আমার মনে হল একটা উদ্গত অনুভূতি বুঝি ওর দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে। তার আগেই চকিতে পিছন ফিরে দ্রুত দরজার দিকে এগোলো সে। একলাই বেরিয়ে গেল।

দুজনেই আমরা চুপচাপ। আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসে।

খানিকবাদে অনেকটা নিজের মনেই বললেন, ভারী অদ্ভুত মেয়েটা, দেখা করবে মনে হয় না···

কে বেশি অদ্ভুত আমি ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না। বললাম, দেখা যাতে করে কলকাতায় ফিরে আমি অন্তত সে-চেষ্টা করব।

চোখের গভীরে খুশির আভাস দেখলাম একটু। সামান্য মাথা নেড়ে সেই অনুরোধই জানালেন। তারপর হঠাৎ আমার সম্পর্কেই সচেতন যেন। বললেন, আপনি আর রাত করছেন কেন, গাড়িতে গিয়ে ঘুমোন। আর বোধহয় দেখা হবে না···

এই লোকের সঙ্গ ছেড়ে একলা ফেরার ইচ্ছেটা ভিতর থেকে যেন মুহূর্তের মধ্যে বাতিল হয়ে গেল। বললাম, বোধহয় হবে। আমও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি···

—কেন? গম্ভীর গলার স্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ আর রূঢ় শোনালো।

শুনে খুশি হবেন ধরে নিয়েছিলাম। এতদিন পাশাপাশি কাটানোর পর এটুকু অন্তরঙ্গতা অপ্রত্যাশিত নয় ভেবেছিলাম।

তার বদলে যেন ধাক্কা খেলাম একটা। বললাম, খানিক আগে আপনিই তো ম্যানেজারকে বললেন, প্রোগ্রাম বাতিল করার মতো সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায় নি।

জবাবে আরো অসহিষ্ণু তিনি।—সেটা আমি রাগের মাথায় বলেছি, সকলে ফিরছে, আপনি ফিরবেন না কেন?

চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, না ফিরলে আপনার কি অস্থবিধে?

জবাবে লালচে বিরক্ত মুখ অন্য দিকে ফেরালেন তিনি। ভিতরে ভিতরে আমি সত্যিই আহত একটু। তবু হাসি মুখেই আবার বললাম, আমার সঙ্গ ভালো না লাগলে আপনি একলাই যাবেন, আপনার মতো বড়লোক না হলেও বাড়তি কিছু ট্রেন ভাড়া বা ট্যাক্সি ভাড়া দেবার মতো সঙ্গতি আমারও আছে, আমিও আলাদাই যাব না হয়। আর, আপনি না চাইলে তিরুপতি পৌঁছেও আপনাকে না চিনতেই চেষ্টা করব।

যা আশা করেছিলাম তাই। আবার এদিকে মুখ ফেরালেন। কিন্তু সেই মুখ পর্যবেক্ষণের জন্য বসে না থেকে উঠে সোজা দরজার দিকে পা বাড়ালাম আমি। ওই মানুষ এই জোরের দিকটাই পছন্দ করেন এতদিনে এটুকু যদি আমার বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে তাহলে কাল আর তিনি আমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইবেন না এও ঠিকই জানি।

পরদিন।

সকাল ছ'টার মধ্যে ঝোলা কাঁধে বাক্স বিছানা নিয়ে নেমে এলাম। সংকল্পের কথা ম্যানেজারকে রাতেই জানিয়ে রেখেছিলাম। শুনে স্মৃতিকণারও মন খারাপ। বলেছিল, আমাকেও নিয়ে চলুন না দাদা, আমার অত ভয়-ডর নেই।

ওকে নিরস্ত করা গেছে। বলেছি, তাহলে আমারই যাওয়া বরবাদ হয়ে যাবে।

শুধু স্মৃতিকণা কেন, আসার সময় কামরার সকলেরই মন বিষণ্ণ একটু। পথের একাত্মতা অনেকখানি নিখাদ বটে।

ওয়েটিং রুমে এসে দেখি মঙ্গল ঘোষ নেই, তাঁর সুটকেস বিছানাও নেই। প্ল্যাটফর্ম-গেট পেরিয়ে বাইরে আসতে তাঁর দেখা মিলল। মনে হল আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। দূর থেকে আমাকে দেখে অল্প অল্প হাসছেন।

কাছে এসে বললাম, সঙ্গে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই মনে হচ্ছে?

জবাবে তেমনি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সব লেখকদেরই বাইরেটা আপনার মতো নরম-সরম নাকি?

অনুমান মিথ্যে হয়নি বলে ভালো লাগছে। জবাব দেবার চেষ্টা না করে জিজ্ঞাসা করলাম, ট্রেনে না মোটরে?

—মোটরে। কোলার থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইলের মধ্যে চিতুর ডিস্ট্রিকট, সেখান থেকে তিরুপতি এক-দেড় ঘণ্টার পথ—একটা গাড়ি ঠিকও করে ফেলেছি। চলুন—

মোটরে ওঠা গেল। নতুন প্রাইভেট গাড়ির মতোই। কত টাকার চুক্তি জানার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা গেল না।

রেল লাইনের পাশে প্রশস্ত পাকা রাস্তা ধরে মোটর ছুটল।

—স্মৃতিকণার কলকাতার ঠিকানা নিয়েছেন?

—নিয়েছি। আমার ঠিকানাও তাকে দিয়ে এসেছি। একটু থেমে হালকা সুরে মনের কথা বলে ফেললাম।—স্মৃতিকণার যেমন মাদুরা লক্ষ্য, তেমনি গোড়া থেকেই আপনার লক্ষ্য তাহলে তিরুপতি?

সামনের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না।

—সেখানেই তিনি আছেন?

গম্ভীর মুখ এদিকে ফিরল এবার।—কে?

—বারো বছরের মিয়াদ ফুরোলে যাঁর দেখা মেলার কথা?

কথাটা উনিই বলেছিলেন মনে পড়ল বোধহয়। আবার সামনের

দিকে চোখ রেখে ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, ওখানে আছেন সেই রকমই খবর আমার।

এ নিয়ে আর কৌতূহল দেখানো সমীচীন বোধ করলাম না। মাঝে মাঝে শুধু লক্ষ্য করছি তাঁকে। গাড়ির গতি ঘণ্টায় কম করে ষাট কিলোমিটারের মতো হবে। চড়াই বা উৎরাই শুরু হয়নি তখনো। তার মধ্যে ক্রমশ নিশ্চল মনে হতে লাগল মানুষটির অস্তিত্ব। অন্যমনস্ক বা চিন্তাচ্ছন্ন নয়। একটা সংকল্পবদ্ধ লক্ষ্যে পদার্পণের নীরবতা যেন।

ভাবছিলাম আমিই। যে রমণীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ভদ্রলোক এতদূরে এসেছেন, বারো বছরের অদর্শনের ফাঁকে তিনি কি এই তীর্থক্ষেত্রে এসে সাধিকা-টাধিকা হয়ে বসে আছেন নাকি?

আমার ঝোলাতেও মাঝারি সাইজের একখানা ইংরেজি বই আছে। নাম শ্রীভেঙ্কটেশ্বর, দি লর্ড অফ দি সেভেন হিল্স, তিরুপতি। আমি ভক্তও নই, তীর্থযাত্রীও না। তবে বিশেষ কোনো নতুন জায়গায় যাব মনে হলে আগে থাকতে তথ্য সংগ্রহ আর পড়াশুনার বাতিক আছে। স্থানমাহাত্ম্যের দিক থেকে তিরুপতিকে বিশিষ্টতম বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভারতের তো বটেই, অনেকের মতে তিরুপতি পৃথিবীর মধ্যে 'রিচেস্ট ডিটি' অর্থাৎ সব থেকে ধনী বিগ্রহ।

এই বিগ্রহটি ঘিরে সেই পৌরাণিক যুগ থেকে অজস্র কাহিনী আর উপ-কাহিনী জড়িয়ে আছে। শত শত বছর ধরে রাজা মহারাজা মুনি ঋষি আর ভক্তজনের বিপুল আগ্রহে এখানে স্বয়ংপ্রকাশ ভেঙ্কটেশ্বরের এই মন্দির আর মন্দিরের এই বিশাল এলাকাটি আজকের দিনের রূপ নিয়েছে। তিরুপতি এখন জাগ্রত তীর্থক্ষেত্র তো বটেই সেইসঙ্গে বহুমুখী কর্মযজ্ঞের এক বিরাট সংস্থা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তিরুপতির ভাণ্ডারের সামান্য আভাস আর কর্মক্ষেত্রের পরিধি

পাঠকের কাছে রোমাঞ্চকর মনে হতে পারে। পরিচালনার দায়িত্ব তিরুপতি-তিরুমালাই দেবস্থানম ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে। সাত পাহাড়ের নিচে ওপরে বিনে মাশুলের বহু চটি তো আছেই, মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত দর্শনার্থীর অবস্থানের জন্য বহু ভাড়াটে ফারনিসড কটেজ আছে, হোটেল-ক্যানটিন আছে।

১৯৬২-৬৩ সালের এক হিসেবে দেখা যায় শুধু ক্যানটিনগুলোর নিরামিষ আহার আর সফট ড্রিংক থেকে বোর্ডের আয় হয়েছে ছয় লক্ষ টাকা। কটেজের আয় কত লক্ষ তার হিসেব নেই। দৈনিক দর্শনার্থী পঁচিশ তিরিশ হাজার থেকে ষাট হাজার পর্যন্ত। ওই বছরে তাদের দেওয়া সোনা-রূপো বিক্রি করে আয় হয়েছে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা। দানের বাকসে নগদ কত লক্ষ টাকা পড়েছে তার হিসেব নজরে পড়েনি। এক-একবারে বিশ তিরিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রণামী রেখে যান এমন ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। প্রভুর কাছে মাথার চুল উৎসর্গ করে যান হাজার হাজার দর্শনার্থী। সেই চুল বিক্রি থেকে ওই বছরের আয় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। ওই চুল চালান দিয়ে বিদেশ থেকে ডলার আসে এমন কথাও কানে এসেছে। দেবস্থানমের অধীনে অজস্র বাস চলাচলের ব্যবস্থা। সকাল থেকে রাতত্বপুর পর্যন্ত তারা যাত্রী আনছে আর পৌঁছে দিচ্ছে। শুধু এই থেকে বোর্ডের বছরে আয় তু কোটি টাকার ওপর। আর সেই বছরের প্রসাদ বিক্রীর আয় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। সঞ্চয়ের এমনি আরো অনেক খুঁটিনাটি দিক আছে। গত বারো বছরে এই আয় আরো ঢের বেড়েছে।

সমস্ত এলাকা জুড়ে দেবস্থানমের নিজস্ব সেচ পানীয় জল আর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। তিরুমালাই থেকে তিরুপতির চূড়া পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল পথ সমস্ত রাতে আলোয় ঝলমল। ধর্মগ্রন্থ ছাপা আর ধর্মানুশীলনের জন্য বড় প্রেস এবং পাবলিসিটি বিভাগ আছে। দেবস্থানমের পরিচালনায় সেখানে মেয়ে পুরুষদের চারটে কলেজ,

তিনটে হাই স্কুল, অনেকগুলো পাঠশালা, বেদ পাঠশালা, আর তিরুপতির শ্রীভেঙ্কটেশ্বর ইউনিভার্সিটি বর্তমান। ইউনিভার্সিটির অধীনে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট গবেষণা কেন্দ্রে সংস্কৃত তেলুগু আর তামিল ভাষার বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুঁথি গবেষকদের কাছে বড় আকর্ষণ। আর আছে একটা বড় হাসপাতাল একটা লেপ্রসি হোম আর একটা অরফেনেজ।

পাশে মঙ্গল ঘোষ নিশ্চল বসে আছেন তেমনি। আমরা রাস্তার দু-পাশের সবুজের মেলা পেরিয়ে এসেছি। দিগন্ত ছোঁয়া ধানক্ষেত, তালকুঞ্জ, নারকেল কুঞ্জ, আর কলার ঝাড় শেষ হয়েছে। সামনে পূর্বঘাট পর্বতমালা, উঁচু-নিচু বন্ধুর জমি। চারদিকে লতা-গুল্ম আর কাঁটার ঝোপ।

আমাদের গাড়ি স্বল্পক্ষণের জন্য যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা পূর্বঘাট পর্বতমালার সানুদেশ বলা যেতে পারে। এখান থেকেই তিরুমালাই-তিরুপতির এলাকা শুরু। এবারে পর পর সাতটি পাহাড় অতিক্রম করে যেতে হবে—চৌদ্দ মাইল পথ। সপ্তম পাহাড়ের শীর্ষদেশে সেই মন্দির নগর যেখানে বিরাজ করছেন দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর।

ওপরে ওঠা শুরু। গাড়ির ধীর বঙ্কিম গতি এখন। তাছাড়া দেখতে দেখতে যাব সেই বাসনায় ড্রাইভারকে আমিই আস্তে চালাতে বলেছি। দু-পাশের সবুজের ভিতর দিয়ে একের পর এক পাহাড় পেরিয়ে চলেছি। সপ্তম পাহাড়ের শীর্ষ প্রাঙ্গণ চার হাজার ছ-শ ফুট উঁচুতে একটা গোপুরম পেরিয়ে গাড়ি সেখানে এসে দাঁড়াল।

পৌঁছে গেছি।

পিছনের ক্যারিয়ার থেকে ড্রাইভার আমাদের মাল নামিয়ে দিল। মঙ্গল ঘোষের পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগটা বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমারও। একটা নীরব ভ্রূকুটিতে আমাকে নিরস্ত করলেন

তিনি। ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব কাটিয়ে ওঠা গেল না। তিনি গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে এনকোয়ারির খোঁজে গেলেন তিনি। থাকার আস্তানা ঠিক করতে হবে।

অন্ধ্রের গোলযোগের দরুন শুনলাম যাত্রীর ভিড় বর্তমানে অর্ধেকও নয়। সেই কারণেই সম্ভবত গেস্ট হাউসে ঘর মিলল একটা। বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা।

সকাল থেকে এ-পর্যন্ত ক'টা কথা বলেছেন মঙ্গল ঘোষ হাতে গোনা যায়। এখনো বেশির ভাগ সময় চুপ-চাপ। স্নান আর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে সোজা বিছানায়। বললেন, রাতে কাল ঘুম হয়নি, এবারে একপ্রস্থ ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

ঘুমের ওষুধ হিসেবেই যেন 'দি সেলফ' চোখের সামনে খুলে ধরলেন। ও-দিকের শয্যা থেকে আমি নিরীক্ষণ করছি তাঁকে। আমার কেমন যেন মনে হল ভিতরে ভিতরে কিছু একটা প্রস্তুতি চলছে তাঁর। স্নায়ুগুলো সব বশে আনার চেষ্টা। এত ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে আমারই ভেতরটা উতলা। এই মানুষের শক্তির দিকটা চিনেছি। খুনের দায়ে সাড়ে ন-বছর জেল খাটার পর নির্লিপ্ত ধৈর্যে আরো আড়াইটে বছর কাটিয়ে এখানে এসেছেন এক রমণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। কোনো ফ্যাসাদের ব্যাপার হবে কিনা কে জানে।

মিনিট দশেকের মধ্যে হাতের বই বুকের ওপর পড়ে থাকল। চোখ বুজে ফেলেছেন।

গত রাতে ঘুম বলতে গেলে আমারও হয়নি। তার ওপর পথের ক্লান্তি। চোখ খুলে দেখি বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। ও-দিকের শয্যা শূন্য।

ধড়মড় করে উঠে বাইরে এলাম। সেখানেও নেই। বেরিয়েছেন। আমাকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে থাকলে ডাকতেন। যে উদ্দেশ্যে তাঁর আসা এখানে না ডাকাই স্বাভাবিক।

খানিকক্ষণের মধ্যে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। জায়গা সুন্দর। মন্দির নগরের এ-দিকটা অন্তত ঘিঞ্জি নয়। দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি। এখানকার সবকিছুই ট্রাস্টের অধীনে। ঘুরতে ঘুরতে মনে হল স্থপতি শিল্পের পাকা মাথার তৈরি পাহাড় চূড়ার এই মন্দির নগর।

বই পড়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুই মেলে না। অনির্দিষ্টের মতো ঘুরে ঘুরে অবাক বিস্ময়ে দেখছি। ভক্ত নই, তবু মনে হল এখানকার বিপুল সৃষ্টি যজ্ঞের পিছনে সত্যিই বুঝি এক সজাগ পুরুষোত্তমের অঙ্গুলিনির্দেশ রয়েছে।

লোকালয় অর্থাৎ বাইরের বিশাল গোপুরম পেরিয়ে মন্দিরের পথে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রায় এক ফার্লং অতিক্রম করার পর সামনে মন্দিরের পথ। এই পথ জনাকীর্ণ। পথের দুধারে দোকান-পাট, বাজার। নতুন মুখ দেখলেই দোকানীরা চেনে, তাদের দূতেরা রাস্তা থেকে ডাকাকাকি হাঁকাহাঁকি করে। দীর্ঘ পথ জোড়া এই মুখর বাজার পেরুলে সামনে মূল মন্দিরে প্রবেশের দরজা।

দরজার ও-ধারে বিশাল বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সামনে নাটমন্দির লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার ও-ধারে কেন্দ্রস্থলে মূল মন্দির। নাটমন্দিরের ঘেরা দিকটা বড় বড় খাঁচা ঘরের মতো। সেখানে প্রতীক্ষা করছেন শত শত দর্শনার্থী। পালা এলে সেখান থেকে তাদের 'কিউ'তে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মূল মন্দিরের বিগ্রহ পর্যন্ত চক্রাকারের এমন দীর্ঘ 'কিউ'র সুব্যবস্থা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। কিউতে দাঁড়ানোর পরেও দু-ঘণ্টার ওপর সময় লাগতে পারে মূল মন্দিরের বিগ্রহের কাছে পৌঁছুতে। তার আগে দর্শনীর টিকিট বিক্রীর সামনেও লম্বা 'কিউ'।

শুনেছি, সাধারণ দিনে দর্শনের সাধারণ টিকিট কিনে ভেঙ্কটেশ্বর বিগ্রহের সামনে পৌঁছুতে পনের ষোল ঘণ্টাও সময় লেগে যায়। অন্ধ্রের গোলযোগের দরুন এখন ভিড় কম নাকি। কিন্তু এই ভিড় দেখেও আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে।

প্রাঙ্গণের একদিকে এই অবেলাতেও বোধহয় শতখানেকের ওপর লোক সারি সারি বসে মাথা কামাচ্ছে। এখানে কেশ মানতের হিড়িকের কথা আগেই বলেছি।

দূরে আর একটা বেষ্টনীর মধ্যে জনাকয়েক লোকের সঙ্গে বসে আছেন মন্দিরের হিসেব রক্ষক। এ সম্বন্ধে একটা মজার কথা শোনা গেছে। প্রতিদিনের দর্শন শেষে হিসেব রক্ষককে বিগ্রহ বালাজীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের হিসেব পড়ে শোনাতে হয়। দর্শনার্থী আর পূজারীদের মানত থেকে দৈনিক আয় হয় চৌদ্দ পনের হাজার টাকা। তার চুলচেরা হিসেব দাখিল করতে হয় স্বয়ং বালাজীর কাছে।

...স্বয়ংপ্রকাশ এই বিগ্রহটিকে কেন্দ্র করে মূল মন্দিরটি গড়েছেন বিজয় নগরের কৃষ্ণ দেব রাই। ১৫০৯ থেকে ১৫২৯—সময় লেগেছে কুড়ি বছর। মন্দিরের সামনে দুই পত্নীসহ তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপন করা আছে। তারপর শত শত বছর ধরে মন্দিরের এই সম্প্রসারণ। এতবড় জমজমাট অবস্থার একটা কারণও আছে। একাদশ শতকের গোল থেকে ধর্ম-তর্ক শুরু হয়েছিল, ভেঙ্কটেশ্বর কে? তিনি শিবের প্রতিভূ কি বিষ্ণুর? তিনি সুব্রমহ্ম স্বামী কি পরাশক্তি? নাকি এই বিগ্রহে দুইয়েরই লক্ষণ আছে বলে একাধারে তিনি হরি এবং হর?

সে-যুগের শিব-সাধকদের সঙ্গে বিতর্কে নেমেছিলেন বিষ্ণু সাধক স্বয়ং রামানুজ। গল্প আছে, রামানুজ নাকি রাজাকে বলে বিষ্ণুর অস্ত্রশস্ত্র আর শিবের অস্ত্রশস্ত্র বিগ্রহের সামনে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিগ্রহ স্বয়ং তাঁর নিজের অস্ত্র ধারণ করবেন। সমস্ত রাত ধরে রামানুজ তারপর আদি-শেষ রূপ বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। পরদিন ঘর খোলা হতে দেখা গেল বিগ্রহ বিষ্ণুর অস্ত্র-শস্ত্রই ধারণ করেছেন। সেই থেকে তিরুমালাই প্রভুর বিষ্ণুপূজা হয়ে আসছে। কিন্তু শৈব অথবা শাক্তরাও সেই আদি যুগের মতোই আজও এই বিগ্রহের পূজা করে আসছেন। একই বিগ্রহ বৈষ্ণব এবং

শাক্তদের পূজা পেয়ে আসছেন এও এক বিরল নজির। ফলে সমস্ত সম্প্রদায়েরই বিপুল সমাবেশ এখানে।

গেস্ট হাউসে ফিরলাম রাত্রি আটটার পর। মঙ্গল ঘোষের তখনো দেখা নেই।

ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। আমাকে শয়ান দেখে সাদাসিধেভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত দিন কি ঘরেই কাটিয়ে দিলেন নাকি?

—না, অনেক ঘুরেছি। আপনি কোথায় গেছলেন?

গায়ের জামা খুলতে খুলতে মুচকি হেসে জবাব দিলেন, আমি গেছলাম একটু তত্ত্ব-তল্লাসী করতে। নিচে নেমেছিলাম।

মুখের হাসি দেখে একটু ভরসা পেলাম। তবু নির্লিপ্ত মুখেই জিজ্ঞাসা করলাম, সুফল হল কিছু?

—হদিস মিলল। দেখা পেলাম না। শুনলাম তিনি বিশেষ কি কাজে গেছেন কালাহস্তিতে—দুই একদিনের মধ্যে ফিরবেন। বত্রিশ মাইল পথ আর ঠেঙাতে ইচ্ছে করল না।

আমিই যেন এক তৃষ্ণার্ত মানুষ জলাশয়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি অথচ তৃষ্ণা মেটাতে পারছি না। উনি নির্বিকার।

জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদর্শন হল আপনার?

বললাম, বাইরে থেকে প্রদক্ষিণ হল। দর্শনের ইচ্ছেও ছিল, কারণ ওই দেবতাটির সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছিলাম—কিন্তু কম ভিড়ের দিনেই লোকের আর কিউর যে বহর দেখলাম—ভাগ্যে দর্শন ঘটবে মনে হয় না।

উনি বললেন, কেন, হাজার খানেক টাকা খরচা করুন, দর্শনের স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—সে-রকম ইচ্ছে নেই। আপনি কি করবেন?

—আমি! অবাক যেন।—আমি তো দেবতা দর্শনে আসিনি

দেবী দর্শনে এসেছি। তাতে পয়সা খরচ নেই। গলায় ঠাণ্ডা সুর। হালকা করে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যেন, বললেন, দেখুন অপেক্ষা করে, ভক্তের সে রকম টান থাকলে দেবতা দর্শন সহজেই হয়ে যেতে পারে।

কোনোরকম ইংগিত করলেন কিনা বোঝা গেল না। প্রসঙ্গের সেখানেই ইতি। তিনি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার খোঁজ নিতে গেলেন।

পরদিন সকালে তাঁকে ঘর থেকেই বার করা গেল না। চা-টা খেয়ে আবার 'দি সেলফ' হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমাকে বললেন, আপনার ইচ্ছে হয় ঘুরে আসুন, আমার দেখার কিছু নেই।

ভাবলাম দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আরো দুবার বেড়িয়েছেন যখন, এ-সব জায়গা হয়তো দেখাই আছে। যাঁর খোঁজে এবারে এখানে আসা, তাঁর দেখা পেয়েছিলেন কিনা সেই কৌতূহল আমার।

কল্লেজ আর ইউনিভার্সিটির ফাঁকা দিকটা ধরে বেড়িয়ে এলাম। ধর্মাচরণের কি সুফল জানি না, সাত পাহাড়ের প্রভুর নামে কর্ম-যজ্ঞের এই ধারাটুকু দু'চোখ ভরে দেখার মতো।

ফিরেছি কম করে ঘণ্টা চারেক বাদে। ঘরে ঢুকে দেখি মঙ্গল ঘোষ বই বুকে নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঘুমুচ্ছেন কি ভাবছেন কিছু ঠাওর করা গেল না। কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঘুমুচ্ছেন। বেশ গাঢ় ঘুম। আর আশ্চর্য প্রশান্ত মুখ। এই মুখ আর এ-রকম ঘুম এতদিনের মধ্যে আর দেখেছি মনে হল না।

বিকেলে একসঙ্গেই বেরিয়েছি দুজনে। মন্দির অর্থাৎ বাজারের দিকে এসেছি। পাহাড় চূড়ার বিশাল মন্দির-নগরের এই দিকে মুখর জীবন। হন হন করে একটা জনস্রোত মন্দিরের দিকে চলেছে। পথের দুপাশের দোকানে তেমনি কেনা-বেচার ধুম।

মঙ্গল ঘোষ দাঁড়িয়ে গেলেন হঠাৎ। কেন দাঁড়ালেন বা কি দেখে দাঁড়ালেন না বুঝে আমিও থেমে তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে আমারই যেন রক্তচাপ বেড়ে গেল হঠাৎ।

...গজ তিরিশেক দূরে একটা দোকানের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে

একজন মহিলা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন। এক নজরেই বাঙালী মনে হল মহিলাটিকে। পরনে তু-ইঞ্চি প্রমাণ সরু খয়েড়া পেড়ে সাদা জমিনের শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ। সাদাটে গায়ের রং, চুল পিছন দিকে টেনে বাঁধা। বেশ দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী। এক নজর দেখে রূপের বিচার ঠিক করে ওঠা গেল না, বেশ সুশ্রী মিষ্টি মুখ মনে হল। যাঁর সঙ্গে কথা কইছেন, তাঁর বয়েস ষাটের ওপরে এবং এ-দেশীয়। তু-ভাঁজ করা সাদা থান-কাপড় লুঙ্গির মতো করে বেড় দিয়ে পরা আতুড় গায়ে সাদা উত্তরীয় জড়ানো, মাথা পরিষ্কার করে কামানো, পিছনে এক গোছা শিখা।

আমার উপস্থিতি ভুলেই গেছেন বোধহয় মঙ্গল ঘোষ। অপলক চোখে সেই দিকেই চেয়ে আছেন। থমথমে মুখে লালচে আভা। চাউনিও কয়েক মুহূর্তের জন্য ঈষৎ ক্রুর যেন।

...এই তাহলে সেই রমণী বারো বছর বাদে যাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছেন—যাঁর অনুতাপ দেখবেন বলে বারো বছর অপেক্ষা করে আছেন।

পায়ে পায়ে সেই দিকে এগোলেন মঙ্গল ঘোষ। পিছনে আমি বিমূঢ়ের মতো অনুসরণ করছি। বিনীত মিষ্টিমুখে মহিলা সঙ্গের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন। হাতখানেকের মধ্যে পাশে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও খেয়াল করলেন না। মঙ্গল ঘোষের পিছনে আমি দাঁড়িয়ে। নিজের দেশের ভাষায় সেই লোকটি কি বলছেন এক বর্ণও বুঝলাম না। মহিলা হাসিমুখে অল্প অল্প মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছেন। আমি দেখছি। রূপসী না হোক বেশ সুশ্রী বলতে হবে। ডাগর চোখের মিষ্টি চাউনি, ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি, বয়েস বত্রিশ তেত্রিশের বেশি মনে হয় না। মঙ্গল ঘোষের বয়েস অনুমান করতে গিয়ে ঠকেছি। তাঁর বয়েস আটচল্লিশ যখন এঁর চল্লিশ বিয়াল্লিশও হতে পারে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন সংযমের একটা কমনীয় শুচিতা জড়িয়ে আছে।

বয়স্ক লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করেই মহিলা একবার পাশের দিকে তাকালেন। পর মুহূর্তে বিষম চমক। সেটা এমন যে তাঁর সামনের বয়স্ক লোকটিও টের পেলেন। কমনীয় হাসিমুখ নিমেষে বর্ণশূন্য হয়ে গেল। তার বদলে চোখ মুখের একটা উদ্গত আতঙ্ক ঠেলে সরাতে চেষ্টা করলেন যেন। আর তারপর অনেকটা জোর করেই সোজা মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

চেয়ে আছেন মঙ্গল ঘোষও। চাউনিটা সামান্য হাসিমাখা এখন। ঠোঁটের ফাঁকেও যেন একটুখানি হাসির রেখা ঝুলছে। গলার স্বর ভারী, তাই খুব মৃদু হলেও স্পষ্ট শোনালো। বললেন, চিনতে পেরেছ মনে হচ্ছে···?

মহিলা জবাব দিলেন না। আস্তে আস্তে সামনের পরিচিত মানুষটার দিকে ফিরলেন তিনি। সেই ভদ্রলোকও ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো। কোন ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলেন বোঝা গেল না। খুব সম্ভব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরিচিত কেউ নাকি? মহিলা সামান্য মাথা নাড়তে তিনি আবার কি দু-চার কথা বলে চলে গেলেন। মহিলা তার আগে দু-হাত জুড়ে নত হয়ে প্রণাম জানালেন তাঁকে।

আবার মুখোমুখি দুজনে। নিজেকে স্থির সংযমে বাঁধার চেষ্টা মহিলার। তবু সমস্ত মুখে লালচে আভা। মঙ্গল ঘোষের দু-চোখের তারায় হাসিটুকু আরো চিকচিক করছে এখন। রমণীটির ভিতরসুদ্ধ দেখে নিচ্ছেন যেন তিনি। গলার স্বর তেমনি মৃদু ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট। বললেন, বারো বছর বাদে আবার দেখা হবে কথাই তো ছিল···অত ঘাবড়ে গেলে কেন?

মহিলা এবারও জবাব দিলেন না। আমার মনে হল ঘাবড়ে যান আর না যান, অপ্রত্যাশিত বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছেন একটা। অপলক দৃষ্টিটা এবার তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে আমার মুখের ওপর এসে স্থির হল। আর মঙ্গল ঘোষও আত্মস্থ যেন তক্ষুনি। ঘাড়

ফিরিয়ে একবার আমাকে দেখে নিয়ে লঘু সুরে বললেন, কি কাণ্ড, আপনি সঙ্গে আছেন ভুলেই গেছি। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমার স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ, ভুল হল…এখানকার পরিচয় ডক্টর সুমিত্রা সরকার…এখানকার বলতে ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একজন পদস্থ কর্মী ইনি—আর ইনি কলকাতার একজন নামী লেখক…

আমার পুরো নাম বলে পরিচয়পর্ব শেষ করলেন। মহিলার দু-চোখের কালো তারা এবার আমার মুখের ওপরেই সামান্য থমকালো যেন। ইত্যবসরে দু-হাত কপালে তুলে নমস্কার জানিয়েছি। সুমিত্রা ঘোষ অথবা সরকার হাত তোলার অবকাশ পেলেন না, তাড়াতাড়িতে সামান্য মাথা নেড়ে প্রত্যুত্তর জ্ঞাপন করলেন। সেই ফাঁকে তাঁর কপাল আর সীমন্তের দিকে চোখ গেছে আমার। কোথাও সিঁদুর আঁচড়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মহিলার চোখের পলকের ভাবান্তরটুকুও মঙ্গল ঘোষের নজর এড়ালো না। তেমনি হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, লেখকের এই নামের সঙ্গে তোমারও পরিচয় আছে নাকি!

ডাগর দু'চোখ এবারে মঙ্গল ঘোষের দিকে ঘুরল। মাথা নাড়ল একটু। অর্থাৎ আছে। কিন্তু আসলে মানুষটাকেই দেখে নিচ্ছেন তিনি। কমনীয় মুখে কঠিন রেখা পড়ছে মনে হল।

মঙ্গল ঘোষের হাসিটা কৃত্রিম কিনা বোঝা গেল না। আমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন, আপনি মশাই সত্যিই ভাগ্যবান মানুষ, দশ বছর অন্ধ্রে কাটিয়েও আপনার নাম মনে রেখেছে…আর আমি এত দিন ধরে একজন নামজাদা লোকের সঙ্গে ঘুরছি, আমারও প্রেস্টিজ কম নয়! চোখে কৌতুক নেচে বেড়াচ্ছে যেন।—ভালো কথা, কৌতুকটা আবার রমণীর মুখের ওপর, দেবদর্শন করতে এসে ভদ্র-লোকের কাল মন্দিরের বাইরে ঘোরাই সার হল, দশ পনের ঘণ্টা কিউতে দাঁড়াতে হয় শুনে ঘাবড়েছেন।…তোমার তো হোল্ড-টোল্ড আছে, সহজেই দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে পারো নিশ্চয়—পারো না?

খুনের দায়ে জেল খেটে বারো বছর বাদে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত কোনো বোঝা-পড়ার উদ্দেশ্যে এসে প্রথম সাক্ষাতে এই হাসি আর পলকা কথাবার্তা। মেকী ভাবছেন মহিলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিষ্টি মুখের ওপর অদৃশ্য কঠিন রেখাগুলো এঁটে বসছে যেন। অপলক চাউনি আরো খরখরে। একটা কঠিন বর্মের আড়ালে নিজেকে যেন প্রস্তুত করে তুলছেন তিনি। এবারেও সামান্য মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, পারেন।

—গুড! কবে? আমার দেবদর্শনের ব্যাপার নিয়েই যেন বিশেষ সমস্যা ছিল তাঁর।

অস্ফুট ঠাণ্ডা জবাব কানে এলো, উনি যেদিন বলবেন।

—ভেরি গুড! সহাস্যে আমার দিকে ফিরলেন, নিশ্চিন্ত তো? বলেছিলাম কিনা ভক্তের সেরকম টান থাকলে দেবতাদর্শন সহজেই হয়ে যাবে!

সুশোভন গোছের একটু সুযোগ পাওয়ামাত্র এঁদের রেখে আমার সরা দরকার অনুভব করছি। কিন্তু পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে আছে। কি করব বা কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

হাসিমুখে মঙ্গল ঘোষই পলকা আলাপে ছেদ টেনে দিলেন এরপর। মহিলার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে হৃষ্ট মন্তব্য করলেন, বেশ ভালোই ছিলে মনে হয়...?

মহিলা নির্বাক, নিরুত্তর। সাদাটে মুখে কঠিন লালচে আভা আরো বেশি জমাট বাঁধছে। মঙ্গল ঘোষের ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের তারায় সেই হাসির আভাস যা সদয় মনে হয় না একটুও। সেই কথাগুলোই মনে পড়ল আবার।...বলেছিলেন, একজনের অনুতাপ দেখব বলে বারোটা বছর অপেক্ষা করে আছেন। বলা বাহুল্য, প্রথম দর্শনে কোনোরকম অনুতাপের ছিটেফোঁটাও দেখছেন না তিনি।

বললেন, তাহলে...? কথাবার্তা দু'চারটে এখানেই হবে না কোথাও যাওয়া যেতে পারে?

সুমিত্রা ঘোষ অথবা সরকারের অপলক চাউনিটা তাঁর মুখের ওপর থেকে নড়ল এবার। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু আহ্বান জানালেন, আসুন—

আমাকে আসতে বলে কথাবার্তা তাঁর দিক থেকে কতটা প্রয়োজন বুঝিয়ে দিলেন যেন। বিপন্ন অবস্থা আমারই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, আমি কেন…

সামলে নিয়ে বললাম, পরে আবার দেখা হবে, নতুন জায়গায় এসেছি, একটু দেখেশুনে বেড়াই—আপনারা যান।

মঙ্গল ঘোষের মুখের অকরুণ হাসিটা আরো ভালো করেই ছড়ালো এবার। সামান্য ভব্যতার আব্রুও একটানে ছিঁড়ে ফেলার মতো করে মহিলাকেই বললেন, ভদ্রলোককে বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই, এসো—

আমি দাঁড়িয়েই আছি। লোকজনের অবিরাম আনাগোনার মাঝখান দিয়ে পাশাপাশিই চলেছেন দুজনে। মন্থর গতি। সেটা রমণীর কারণে, মঙ্গল ঘোষ লম্বা পা ফেলে অভ্যস্ত। সচল জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ওই দুজনকেই দেখছি।

…পাশাপাশি চলা সত্ত্বেও ওঁদের বিচ্ছিন্নই মনে হচ্ছিল আমার। বারো বছরের বিচ্ছেদের পরে যেটুকু দেখলাম তার ফলেই হয়তো। মঙ্গল ঘোষ পরিচয় দিলেন, তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ। তার মানে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ডিভোর্স হয়নি। অবশ্য পরে বলেছেন, এখানকার কর্মস্থলে তাঁর পরিচয় সুমিত্রা সরকার। অর্থাৎ স্বামীর পদবী বর্জন করেছেন মহিলা

ভিড়ে আর বেশিক্ষণ ওঁদের দেখা গেল না। আমিও মন্দিরের দিকেই ফিরলাম। কিন্তু এখানে আর যেন আমার দেখার কিছু নেই। ঘরে ফেরার আগে খানিকক্ষণ সময় কাটানোর দরকার মাত্র। ওই একটি পুরুষ আর একটি রমণী আমার ভিতর জুড়ে বসেছে। খানিক আগের কোনো একটি মুহূর্তও এই দুটো চোখের অগোচরে পার হয়েছে

মনে হয় না। ওই লোককে প্রথম দেখা মাত্র সুমিত্রা ঘোষ বিষম চমকে উঠেছিলেন। সাদাটে মুখ নিমেষে আরো সাদা হয়ে গেছল। সেটা কি ভয়ে? আতঙ্কে? খুনের দায়ে সাড়ে ন'বছর জেল খেটে আর তারপরে আরো আড়াই বছর কাটিয়ে মঙ্গল ঘোষ কি কোনো রকম প্রতিশোধ নেবার তাগিদে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু নিজের ভিতরেই সেটা বাতিল করার তাড়না। ওই সবল মানুষের যে দিকটা এত দিনের মধ্যে আমার কাছে আয়নার মতো স্বচ্ছ, তাঁকে চিনতে এত ভুল হতে পারে না। ওই পুরুষ প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও হতে পারেন, কিন্তু কাপুরুষের মতো কিছু একটা করে বসতে পারেন না।

তবু অস্বস্তি। মানুষটার খুনের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ওই মহিলার কোনো যোগ আছে সেটা প্রায় অবধারিত অনুমান। আর, খুব সম্ভব সেই কারণেই বারো বছর পরের সাক্ষাতে স্ত্রীর অনুতাপ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সুমিত্রা ঘোষের আচরণে যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে সেটা তার বিপরীত। সেটা ঘৃণা হতে পারে বিদ্বেষ হতে পারে, আবার ওই মানুষের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার একটা কঠিন প্রস্তুতিও হতে পারে। নিজের চমক-লাগা হতচকিত অবস্থাটা সামলে নিতে খুব সময় লাগেনি তাঁর। সাদাটে মুখে যে লালচে বর্মটা এঁটে বসতে দেখেছি সেটা শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে বলে মনে হয়নি আমার।

ভিতরের অস্বস্তিটা হয়তো সেই কারণে।

কিন্তু বারো বছর বাদে ওই সবল পুরুষ শুধুই কি এক রমণীর অনুতাপ দেখার তাগিদে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? অন্ত্রে আসা হবে না শুনে ওই লোক ছেলেমানুষের মতো ক্ষেপে উঠেছিলেন শুধু এটুকু প্রত্যাশা নিষ্ফল হল ভেবে? মাত্র দশ মিনিটের জন্যে হলেও ওই মহিলাকে দেখে আমার তা মনে হয় না। এখনো মনে হচ্ছে না। মনে না হওয়ার মতো আরো কিছু সম্পদ যেন তাঁর মধ্যে আছে।

…রূপ? স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব? না, সামনাসামনি এসে দেখার পর বলতে পারি সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি আর কমনীয় বটে, কিন্তু এঁর থেকে নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ঢের বেশি রূপসী মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। আর, বারো বছর বাদে মঙ্গল ঘোষের মতো ধনী সুপুরুষ শুধু এটুকুর জন্যেই এতদূর ছুটে আসেন নি।

…তাহলে কি?

যেটুকু দেখেছি, আমার মনে হয় সেটা তাঁর ভিতরের পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের রূপ। যা অনেক রূপসী মেয়ের মধ্যেও মেলে না। মঙ্গল ঘোষ যেমন জাঁদরেল পুরুষ এই রমণীও তেমনি কোনো সবল সত্তার প্রতীক। অনুতাপ দেখার আকর্ষণটুকুই প্রতীক্ষার একমাত্র কারণ মঙ্গল ঘোষের এ হতে পারে না।

একলা ঘোরাঘুরি করতে আর ভাল লাগল না। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। তারপর থেকে উদগ্রীব প্রতীক্ষা।

তিনি এলেন রাত্রি দশটার পরে। সেই মুখ চোখে পড়ামাত্র ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। ঋজু কঠিন এমন থমথমে মুখ এত দিনের মধ্যে আর দেখিনি। ভিতরের অসহিষ্ণুতা ফেটে পড়তে চাইছে অথচ ফেটে পড়তে দেবেন না এই পণ যেন।

বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া হয়েছে?

—না, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

বিরক্তির ছোট একটা ঝাপটা খেলাম। অর্থাৎ কোন প্রতীক্ষায় বসে আছি সেটা তিনি ভালো করেই জানেন। ডাকলেন, আসুন—

ছোট টেবিলে দুজনে মুখোমুখি খেতে বসেছি। নীরবে হাত মুখ চলছে দুজনার। খাওয়া প্রায় শেষ করে এনে হঠাৎ মুখ তুলে সোজা তাকালেন আমার দিকে। গলার স্বর জলদ গম্ভীর।—শুনুন, কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।…আপনি কি করবেন?

তাকালাম আমিও। বিস্ময়ের বদলে আঘাতই পেলাম যেন।

নরম করে জিজ্ঞাসা করলাম, এরই মধ্যে আপনাদের বোঝাপড়া হয়ে গেল।

—এরই মধ্যে নয় বোঝাপড়া যা হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়েছে। আমি এতক্ষণ ফাঁকা মাঠে বসেছিলাম।

—মিসেস ঘোষের ওখানে আপনি যাননি মোটে!

—গেছলাম। আমার যা বলার বলেছি, তার যা বলার শুনেছি। আপাতত এখানকার কাজ শেষ আমার। যাক, আপনি কাল যাচ্ছেন কি যাচ্ছেন না?

…কাল কখন?

—সকালের প্রথম বাসে নেমে যেতে চেষ্টা করব, রেনিগুণ্টা থেকে ট্রেন কখন জানি না।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপচাপ খাওয়া শেষ করে নিলাম। ফলে ভদ্রলোকের অসহিষ্ণুতা আরো একটু বাড়ল বোধহয়। বললেন, শুনুন আপনার ইচ্ছে হয় যাবেন, না ইচ্ছে হয় যাবেন না। শুধু একটা কথা, না যদি যান সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হলে আপনি আমার হয়ে কোনোরকম ওকালতি করতে যাবেন না।

খুব প্রচ্ছন্ন কৌতুকের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি করি আপনি জানছেন কি করে?

রুষ্ট মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

ঘরে নয়, বাইরের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করছেন দেখলাম। আমি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। একটু বাদে বাইরের একটা ডেক চেয়ারে বসলেন তিনি।

পায়ে পায়ে কাছে এলাম। ঘাড় ফিরিয়ে মঙ্গল ঘোষ স্থির চোখে তাকালেন। মনে হল রাগের আড়ালে পুরুষের অভিমানাহত মুখ দেখলাম।

বললাম, আমি কাল আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না।…কিন্তু কথা দিতে পারি আপনি না চাইলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখাও

করব না। কিন্তু এতদিন পাশাপাশি থাকার পর আমার ওপরেও আপনার আর একটু বেশি আস্থা আশা করেছিলাম। ওকালতি করতে গিয়ে আপনার আমি অসম্মান করতে পারি এ আপনার মনে হল কি করে?

তেমনি চেয়ে রইলেন। আমি আবার বললাম, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আপনার আছে। আপনার আশঙ্কাও হয়তো ওই কারণে···।

আরো একটু চেয়ে থেকে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে মঙ্গল ঘোষ বললেন, বসুন।

গম্ভীর গলার স্বর এবারে শান্ত একটু। বসলাম। আমার মন বলল, একটা বিশেষ মুহূর্ত এবারে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ হাসলেন একটু তিনি। সেই হাসিতেও পুরুষের ক্ষোভই ঝরল যেন। বললেন, আসল কথা কি জানেন, আমার স্ত্রী আমাকে বিশ্বাস করল না, বিশ্বাস করতে চাইল না। কারণ, বিশ্বাস করলে আমার অপরাধের কিছু ভাগ অন্তত তার কাঁধেও এসে পড়ে। সেটা এড়াবার জন্যেই সে এখানে কাজ নিয়ে পড়ে আছে, এখানকার দেবতা পুরুষোত্তমের সেবায় মন ঢেলেছে। আমি তাকে বলে এসেছি আজ হোক কাল হোক বা দু-পাঁচ বছর পরে হোক তার বিবেকই তাকে আমার কাছে ঠেলে পাঠাবে, পুরুষোত্তমের মধ্যে যদি পুরুষের ছিটে ফোঁটাও থেকে থাকে সে তাকে রেহাই দেবে না—তখন যেন সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার মতো জোরটুকু থাকে। তাই বলছি, আমার কথা ভেবে আপনি কষ্ট পাবেন না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আপনার কথা বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে······কিন্তু এর পরেও আপনি আমাকে আর কতটা অন্ধকারের মধ্যে রাখবেন?

···তারপর।

তারপর রাতের প্রহর একে একে পার হয়েছে। মন্দির-নগর

ঘুমিয়েছে। আমরা দুটি প্রাণী পাশাপাশি বসে। আত্মগত তন্ময়তায় একটু একটু করে দুটি জীবনের চিত্র আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। তেমনি স্তব্ধ একাগ্রতায় আমি শুধু শুনে গেছি। নিজের দোষ ত্রুটির কথাও অকপটে বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভালোয়-মন্দে মেশানো পুরুষের এমন এক পরিপূর্ণ রূপ আর বুঝি দেখিনি।

পুব আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আরো খানিক বাদে কাছের দূরের পাহাড়গুলো মেঘের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। বসেই আছি। প্রকৃতির রং-বদল দেখছি। পুবের সোনা এখন ওই মেঘের স্তূপগুলোর গায়ে ঠিকরে পড়ছে।

পাশের ডেক চেয়ার খালি। আমিও উঠলাম একসময়। ঘরে তখন মঙ্গল ঘোষের হোল্ড-অল বাঁধা শেষ। স্যুটকেসটা টেনে হোল্ড-অলের পাশে রাখলেন। এবারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত।

আমার দিকে ফিরে দাঁড়াতে বললাম, আমারও একান্ত বিশ্বাস সুমিত্রাকে আপনি যে-কথা বলে এসেছেন সেটাই সত্যি হবে।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

জীবন আর জীবন-কাহিনীতে তফাৎ কতটুকু? মঙ্গল ঘোষ লিখলে সেটা জীবন হত। আমি লিখছি তাই কাহিনী। কাহিনীতে কল্পনার অবকাশ কিছু থাকতেই পারে। কিন্তু এ-কাহিনীতে আমার রং-ফলানোর খুব একটা প্রয়োজন নেই। কারণ জীবনের এই নাটক কাহিনীর থেকেও বিচিত্রতর। দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ…

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্কুল মাষ্টারের পাঁচ মেয়ের এক মেয়ে সুমিত্রা সরকার। মেয়েদের মধ্যে ছোট, কিন্তু তার পরেও আরো দুটি ভাই। বাপের সঙ্গে ছেলে মেয়েদের খুব কমই দেখা হত। সকালে বিকেলে তাঁর ছাত্র পড়ানো, দুপুরে স্কুল। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে সাতটি সন্তানের মা অকালে দেহ রেখেছেন। বয়েসকালে সেই মা-টি সুশ্রী ছিলেন। বরাত জোরে সব ক'টা মেয়ের চেহারাপত্র ভালো। আর লেখা পড়াতেও স্কুল কলেজে ভালো রেজাণ্ট তাদের। একটা মেয়েরও পয়সা দিয়ে পড়ার দরকার হয় নি। বৃত্তি বা স্কলারশিপ না পেলে বাবা পড়া চালাতে পারবেন না এ সকলেরই জানা ছিল। বি-এ পাসের আগে প্রথম তিন মেয়ে চেহারার জোরে মোটামুটি ভালো ঘরে বরে পার হয়ে গেছে। প্রায় নিখরচায় বিয়ে হলেও বাপের সামান্য সঞ্চয় ওতেই নিঃশেষ। সঙ্কট দেখা দিয়েছিল চতুর্থ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। তাঁরই চেহারা বোধহয় সব থেকে ভালো। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পরে বেশ ধার-দেনা করেই বাবা এই মেয়েরও ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দিন যেখানে সন্ধ্যায় বর আসার কথা, সেখানে বিকেলে বরের বাড়ি থেকে খবর এলো এখানে

তাঁদের ছেলের বিয়ে হবে না এবং না হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ তাঁদের হাতে আছে।

মেয়ের বাপ পাগলের মতো বরের বাড়িতে ছুটে গেলেন। বরের বাপের সাফ জবাব। ওই মেয়ের নামে তিন-তিনটি কুৎসিত চিঠি তাঁর হাতে এসেছে। এও বাজে ছেলে ছোকরার কাণ্ড ভাবা গেছে। কিন্তু সেইদিনই দল বেঁধে যারা হুমকি দিয়ে গেছে তারপর সেখানে তিনি আর ছেলে নিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন না। তাছাড়া মেয়ের সম্পর্কেও অনেক কথা গোপন করা হয়েছে। মেয়ে কলেজে আর পাড়ায় থিয়েটার করে বেড়ায় এ-খবর তাঁদের জানা ছিল না।

শেষের অভিযোগ সত্যিও নয় আবার একেবারে মিথ্যেও নয়। থিয়েটার করে বেড়ানোর এক অর্থ। রূপসী হাসিখুশি ওই মেয়েটার মেয়ে-কলেজের ফাংশানে আর পাড়ার অভিজাত ভদ্রমণ্ডলীর অনুরোধ উপরোধে বিশেষ কল্যাণকর অর্থাৎ চ্যারিটি শো-এর ভদ্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আর এক অর্থ।

মেয়ের শাস্ত্রজ্ঞ বাপ কেঁদে ফেললেন, ছেলের বাপের হাতে পায়ে ধরলেন। কিন্তু সব-কিছুর জবাবে শেষ পর্যন্ত অপমান হয়ে ফিরলেন তিনি।

এই অপমানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সুমিত্রার ওপরের ওই দিদির আত্মহত্যায়। রূপসী দিদির সেই বীভৎস পরিণাম জীবনে ভোলবার নয়। সুমিত্রাও তখন কলেজের ছাত্রী। অপমানিত ঋণগ্রস্ত বাপের কাছে তাঁর শেষ অনমিত আবেদন, বাবা যেন কক্ষনো কোনো দিন তাঁর বিয়ের চিন্তায় মাথা না ঘামান।

ছোট মেয়ের শোক আর সঙ্কল্প দুইই বাবা বুঝে নিয়েছিলেন। এবং সুমিত্রার এম-এ পাসের পরেও সে-চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন।

বি-এ আর এম-এ দুটোতেই প্রথম শ্রেণীর প্রথম সুমিত্রা সরকার। বিষয় সংস্কৃত। এই বিষয়ে তাঁর গোড়ার ভিত বাপের হাতে গড়া। আপনা থেকেই সেটা পাকাপোক্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটির এক

নামকরা অধ্যাপক বিশেষ সদয় তাঁর ওপর। তাঁরই অনুগ্রহ আর সুপারিশে ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামের রিসার্চ স্কলার হতে পেরেছেন। ফেলোশিপ পেয়েছেন তিন বছরের জন্য। মাসে তিন শ' টাকা করে পান। এছাড়া বইপত্র কেনা আর আনুষঙ্গিক খরচের জন্যেও বছরে হাজার বারো শ' টাকা বরাদ্দ। একাগ্র নিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন সুমিত্রা, তবু তিন বছরের ফেলোশিপের মিয়াদ চতুর্থ বছরে গড়িয়েছে। কারণ যে অধ্যাপকটির অধীনে তাঁর কাজ, তিনি যতো স্নেহপরায়ণই হোন, সামগ্রিক সম্পূর্ণতার দিকে তাঁর অনাপোষ ঝোঁক। তাঁরই উপদেশ আর উৎসাহে গবেষণার সূত্র বেড়েই চলেছে। আর তাঁরই সুপারিশে চতুর্থ বছরেও সুমিত্রার ফেলোশিপের মাসিক বরাদ্দ অক্ষুণ্ণ আছে।

এই সময় সুমিত্রার বয়েস সাতাশ। এর ঢের আগে থেকে কলেজের তরুণ মাস্টার বা ইউনিভার্সিটির রসিক ছাত্রদের প্রেম-প্রীতির হামলা তার ওপর হয়নি এমন নয়। কিন্তু সেই সবই তাঁর মনের ওপর দিয়ে পদ্ম-পাতায় জলের মতো বিনা দাগে গড়িয়ে গেছে। বিয়ের কথা মনে হলেই দিদির গলায় দড়ি দেওয়া বীভৎস ঝুলন্ত মূর্তিটা চোখে ভাসে তাঁর। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে মনের তলায় চাপা আক্রোশও আছে একটা। সেই অপমান আর দিদির সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরেও সংসারের দায়ে বাবা চাকরি করে চলেছেন বটে, কিন্তু সেই থেকে ভিতরে বাইরে আধা পঙ্গু তিনি।

সুমিত্রাদের সংসার তখন মানুষ বলতে চারটি প্রাণী। বাবা সুমিত্রা নিজে আর ছোট দুটো ভাই। সাময়িক অভাবের ব্যাপার ছাড়া সংসার মোটামুটি নিরুপদ্রবে চলার কথা কিন্তু উপদ্রব ওঁদের ঘরেই। সুমিত্রার পরের ভাইটা। পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে রাজনীতি যে ঢুকেছে। সময়ে অসময়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ায়। তার খোঁজে বাড়িতে পুলিসের উপদ্রবও আছে। ভাইটাও যখন-তখন ধূমকেতুর

মতো বাড়িতে হাজিরা দেয়। বাপের কাছ থেকে বা দিদির কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। বাবা তাকে ভয় করেন। সুমিত্রা তাকে চোখ রাঙান বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁরও অস্বস্তি। পুলিসের ভয় না থাকলে ওই ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক শুধু খাওয়া-শোয়ার। তখনো তার অবুঝ উপদ্রব লেগেই আছে। একেবারে ছোট ভাইটা অবশ্য সে-রকম সেয়ানা হয়ে ওঠেনি এখনো। সতের বছর মাত্র বয়েস। এবারে হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছে। পড়াশুনায় মতি আছে কিছুটা। ফল ভালোই করবে আশা করা যায়। এখন পর্যন্ত দিদির অনুগত। আগের ভাইটার জন্য এ-ও পরে কি-রকম হয়ে উঠবে তাই নিয়ে সুমিত্রার মনে চাপা অশান্তি।

কিন্তু নিজের কাজের চাপে খুব একটা ভাবনা চিন্তার সময় হয় না। কাজ নিয়ে বসলে আহার-নিদ্রা ভুল হয়ে যায়। যা নিয়ে ডুবে আছে তাই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। জীবনের সব থেকে বড় লক্ষ্যের কিনারায় এসে দাঁড়ানো গেছে। আর বড় জোর একটা বছর। গবেষণার ব্যাপারে তাঁর অফুরন্ত নিষ্ঠা, আর উৎসাহ উদ্দীপনা।

জীবনের এই পর্যায়ে নাটকীয় যোগাযোগ একজনের সঙ্গে।

যোগাযোগটা সুমিত্রার গবেষণার পথ ধরেই। গবেষণার বিষয় পৌরাণিক যুগ থেকে সাময়িক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য এবং কাব্যে রসের সন্ধান। রসের ওপরে বহু গ্রন্থ ছেঁকে এই বৃহৎ অনুসন্ধান মোটামুটি শেষ করে আনা গেছে। আট শতকে অভিনব গুপ্তর অভিনবভারতী এবং সেই সময়ের ভট্টলোল্লট আর উদ্ভটএর অলঙ্কার-সর্বস্ব, নয় শতকে ভট্টনায়কের হৃদয়দর্পণ আর ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য বিচারচর্চা, এগারো-শতকে মমএর কাব্য প্রকাশ আর মহিমভট্টের ব্যক্তিবিবেক, পনের শতকে বিশ্বনাথএর সাহিত্যদর্পণ ইত্যাদির যাবতীয় রসানুসন্ধান শেষ। গ্রীক পুরাণের বিষয়গত আধুনিক সংস্কৃত অনুবাদের তথ্যও বাদ পড়েনি। কিন্তু গবেষণার পরিচালনার বৃদ্ধ অধ্যাপকটি কড়া রসিক মানুষ। ছাত্রীকে বলেন, এবারে পঁথি

অনুশীলন করে দেখো কি পাও। এই কারণেই তিন বছরের কাজ চার বছরে গড়িয়েছে। ভদ্রলোকের নিজেরও উৎসাহের শেষ নেই। বলেন, বৈষ্ণবদর্শনে ঈশ্বর রসিকচূড়ামণি। রসো বৈ সঃ—তিনি রস। তাছাড়া রসের আর কি রূপ? ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ, ব্রহ্মজ্ঞানের যে স্বাদ কাব্যে সাহিত্যে রস হল তার সহোদর। অতএব পুঁথি ঘেঁটে দেখো কি সন্ধান পাও।

সুমিত্রা সেই কাজে লেগেছেন। তাঁরও উদ্যমের শেষ নেই। মিউজিয়াম এবং বড় লাইব্রেরির পুঁথি-পত্র ঘাঁটা শেষ। এখন বাইরে কোথায় কোন পুঁথি আছে সেই খোঁজে আছেন। এই সময় পরিচালক বৃদ্ধ অধ্যাপকটির হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাঁকুড়ায় তাঁর এক প্রাক্তন জমিদার বন্ধুর হেপাজতে অনেক পৌরাণিক গ্রন্থ আর দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আছে। বংশগতভাবে সেই বন্ধুটি ওই সবের মালিক।

তক্ষুনি বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখে সুমিত্রার হাতে দিলেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়াতে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করো। তাঁর মস্ত লাইব্রেরি ছিল, সেখানে অনেক পুঁথি ছিল এককালে—গিয়ে দেখো কি পাও।

নির্দেশ মতো সুমিত্রা বাঁকুড়ায় এলেন, অপরিচিত জায়গা। কিন্তু পরিচিত একজন আছেন, এক অন্তরঙ্গ বান্ধবীর দিদি। এখানকার মেয়ে স্কুলের টিচার তিনি, হোস্টেলে থাকেন, নিজস্ব আলাদা ঘর আছে। কিন্তু হোস্টেলে এসে শোনেন দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে সেই মহিলা কলকাতায় চলে এসেছেন। তাঁর ঘর তালাবন্ধ। সেই সন্ধ্যাতেই তাঁর ফেরার কথা।

অতএব ছোট স্যুটকেস হাতে সোজা শুশুনিয়ার বাসে চেপে বসলেন সুমিত্রা। ছেলেবেলা থেকে নিজের সমস্ত দায়িত্ব নিজের, কোনো কিছুতে সহজে ঘাবড়াবার পাত্রী নন। তাছাড়া যাচ্ছেন তো অধ্যাপকের বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে, দরকার পড়লে সেখানে দুটো একটা দিন থাকার ব্যবস্থা হয়তো তিনিই করবেন।

বাসে বাঁকুড়া থেকে শুশুনিয়া মাইল আঠের পথ। সেখানকার বর্ধিষ্ণু বীরশাল গ্রামে যেতে হবে। সেখানেই অধ্যাপকের বন্ধুর বিশাল দালান-কোঠা শুনেছেন। যে-কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলে জমিদার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। স্থানীয় লোকে এখনো ওটাকে জমিদার বাড়িই বলে নাকি।

শুশুনিয়া পর্যন্ত বাস। সামনে জোড়া পাহাড়। বাস থেকে নেমে এক মাইলের মধ্যে বীরশাল গ্রাম। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। সাইকেল রিকশঅলাই তাঁকে জমিদার বাড়ির ফটকের সামনে নামিয়ে দিল।

বাড়ি বলতে সেকেলে গড়নের বিশাল চকমিলানো দালান। দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে বাইরেটা মলিন। ভিতরের অবস্থাও খুব ভালো মনে হল না সুমিত্রার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরটা বনেদি আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো। কিন্তু এ-যাত্রায় সুমিত্রার কপালই মন্দ বোধহয়। বাইরের ঘরে বাড়ির সরকার গোছের মাঝবয়সী লোকটার কাছে গৃহস্বামীর নাম করতে সে অবাক।

—কর্তাবাবু তো দু'বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন।

শুনে সুমিত্রা দমে গেলেন। যাঁর কাছে প্রোফেসারের চিঠি তিনি মৃত। তবু আশা। খোঁজ নিলেন, এ বাড়িতে আর কে আছেন …মানে এখানকার মালিক এখন কে?

—কর্তাবাবুর ছেলে মালিক। কিন্তু তিনিও তো শিকারে গেছেন, তবে ফেরার সময় হয়ে গেছে অবশ্য, যে-কোনো দিন ফিরতে পারেন।

—বাড়িতে আর কেউ নেই?

—আজ্ঞে না, দুজন চাকর-বাকর শুধু আছে।

অর্থাৎ ছেলে অবিবাহিত কিংবা বিপত্নীক। সুমিত্রা যে-কাজে এসেছেন তার গুরুত্ব কম নয়। অতএব খোঁজ নিলেন বর্তমান মালিক কবে কোথায় শিকারে গেছেন।

সরকার জানালো, শিকারে গেছেন ছ'দিন আগে, কোথায় গেছেন

তার জানা নেই। কবে নাগাত ফিরতে পারেন বলে গেছলেন। গতকাল তাঁর ফেরার দিন গেছে।

এরপর আপাতত বাঁকুড়ায় ফেরা ছাড়া গতি কি। কি ভাগ্যি সেখান থেকে রওনা হবার আগে দিনের খাওয়াটা সেরে নিয়েছিলেন। কপাল ঠুকে কাল বা পরশু আর একবার এসে খবর নেওয়া যেতে পারে। খোঁজ নিতে সরকার জানালেন বাঁকুড়ার ফেরত বাস সেই বিকেল ছ'টায়।

ছোট সুটকেস হাতে বেরিয়ে পড়লেন আবার। দিনটা মেঘলা। হাঁটতে ভালো লাগল। বেলা সবে দুটো। অঢেল সময় হাতে। বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ের দিকে চললেন। কোনোরকম অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে পাহাড়ের যে দিকটা একেবারে নির্জন সেইদিকে এসে পড়লেন। মেঘলা দিনের এই পাহাড়ী নির্জনতাও ভালো লাগছে। অদূরে প্রায় শুকনো গন্ধেশ্বরী নদী। পিছনেই জঙ্গল।

সুটকেসটা পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের ওপর রেখে মন্থর পায়ে হাঁটছেন, এক-একটা পছন্দসই নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে নিচ্ছেন, আবার ফেলে দিয়ে নতুন পাথর কুড়োচ্ছেন। কখনো বা একটা দুটো পাহাড়ী ফুল ছিঁড়ছেন।

সেই সময় আচমকা এক নাটকীয় ব্যাপার। স্তব্ধতা খানখান করে হঠাৎ গুলীর শব্দ। সুমিত্রা এমন চমকে উঠেছেন যে গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো একটা। বিবর্ণ মুখ তুলে দেখেন গজ পঞ্চাশ দূরে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর পাতলা কোর্তা পরা একটা মানুষ। তার রাইফেলের নল সোজা তাঁকে নিশানা করছে। মুহূর্তে একটা অজানা আতঙ্কে শরীরের সমস্ত রক্ত শিরশির করে উঠল। পাগল নাকি লোকটা! এ কি করছে!

কিন্তু বগলে ধরা বন্দুকটা চোখের কাছ থেকে নেমে এলো। তারপর রাইফেল বগলে করে সেই লোক শিথিল পায়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে আসতে দেখলেন বলিষ্ঠ সুপুরুষ

মানুষটা। কিন্তু এ-রকম রসিকতার ফলে সুমিত্রার দস্তুর মতো রাগ হয়ে গেছে। তাছাড়া এই নির্জনে লোকটা এ-রকম অভদ্র আচরণ করার পর কি মতলবে এসে দাঁড়াল কে জানে। রাগত স্বরেই বলে উঠলেন, কে আপনি? এ-রকম ব্যবহারের অর্থ কি?

বছর তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে মানুষটার বয়েস। গভীর টানা দু-চোখ মেলে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন একটু। তারপর বগলের রাইফেলটা নেড়েই বললেন, ও-দিকে ফিরুন—পিছন দিকে।

পুরুষের নিটোল পুষ্ট গলা। কিছু না বুঝেই সুমিত্রা পিছন ফিরে তাকালেন একবার। আর তারপরেই বিষম আঁতকে উঠলেন একেবারে। গজ বিশেক দূরে একটা মাঝারি সাইজের ভালুক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

পিছনে ঈষৎ ব্যঙ্গ মেশানো সেই গলা শোনা গেল আবার।—ব্যবহারের অর্থটা এবারে পরিষ্কার হয়েছে? জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওঁ জীবটি আপনার সঙ্গ নিয়েছিলেন, আর একটু দেরি হলে আমার বদলে ওঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হত।

লম্বা পা ফেলে ভালুকটার দিকে এগোলেন ভদ্রলোক। মোক্ষম জায়গায় লাগার ফলে এক গুলীতেই শেষ। বন্দুকের নল দিয়ে মৃত ভালুকটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন তিনি। ভয়ে বিমূঢ় সুমিত্রা সেখানেই দাঁড়িয়ে। সাহস করে এক পাও এগোতে পারছেন না।

লোকটাই ফিরে এলেন আবার। আর এক দফা তাঁকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানকার কেউ নন বুঝতে পারছি—পাহাড়ের এদিকে বেড়াবার পরামর্শ আপনাকে কে দিয়েছে?

—এদিকে এ-রকম ভয় আছে আমি ঠিক জানতুম না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ষষ্ঠ চেতনার কাজ শুরু হল সুমিত্রার মাথায়। ইনিই সেই জমিদার বাড়ির মৃত মালিকের শিকারী ছেলে নন তো! চেহারা দেখে হোক বা হাতে বন্দুক দেখে হোক সেই রকমই মনে হল সুমিত্রার। তাছাড়া গতকালই ফেরার কথা গেছে তাঁর শুনেছেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বাঁকড়ো থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন ?

—না, আমি কলকাতা থেকে বাঁকড়ো হয়ে এখানে এসেছি। বীরশালের জমিদার বাড়ির মালিকের কাছে একটা জরুরী দরকারে এসেছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম তিনি দু'বছর আগে মারা গেছেন—তাঁর ছেলেও বাড়ি নেই।

লোকটি এতগুলো কথা শোনার পর থমকে তাকালেন তাঁর দিকে। কি রকম যেন সন্দিগ্ধ গোছের স্থির চাউনি। বললেন, আমিই তাঁর ছেলে, নাম মঙ্গল ঘোষ।

সুমিত্রার অনুমান ঠিক। ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়াতেই বড় ঘরের ছেলে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু চাউনির তফাৎটুকুর কারণ বুঝে উঠলেন না। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে খাম বার করলেন। —আমার প্রোফেসার জানতেন না আপনার বাবা নেই, তিনি এ চিঠিখানা দিয়েছিলেন।

হাত বাড়িয়ে মঙ্গল ঘোষ খামটা নিলেন। বন্দুকের বাট মাটিতে রেখে নলটা নিজের পেটের নিচে ঠেকা দিয়ে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন। প্রোফেসারের ওই ছাপ-মারা প্যাডের কাগজে শুধু উদ্দেশ্যের কথা নয়, ছাত্রীর সম্পর্কে কিছু উচ্ছ্বাসের কথাও লেখা ছিল সুমিত্রা জানেন। চিঠি পড়তে পড়তে ভদ্রলোকের মুখভাব বদলাচ্ছে লক্ষ্য করলেন। চাউনিটাও এবারে অপ্রতিভ গোছের নরম দেখালো।

—আজই কলকাতা থেকে বাঁকড়ো হয়ে আপনি এখানে এসেছেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার তো খুব ধকল গেছে তাহলে, সমস্ত দিন খাওয়া-দাওয়াও হয় নি বোধহয় ?

অল্প হেসে সুমিত্রা জবাব দিলেন, বাঁকড়ো থেকে খেয়ে নিয়েছিলাম। তার পরেই পিছন ফিরে সভয়ে অদূরের মৃত

ভালুকটাকে দেখে নিলেন একবার। বললেন, খাওয়া রিসার্চ সবই বরাবরকার মতো হয়ে গেছল—

হাসি মুখে সায় দিলেন মঙ্গল ঘোষ, বললেন, হ্যাঁ এদের পাল্লায় পড়ে গেলে আস্ত থাকা শক্ত। ছোট ভালুক মানুষ দেখলে পালায়, এটা নেহাৎ ছোট নয়। আসুন—

সুমিত্রা পলকে ভেবে নিলেন একটু।—আপনাদের বড় লাইব্রেরি শুনেছি, আজ আর কতটুকু দেখার সময় পাব, কাল সকালের বাসে চলে আসব না হয়—

—আজ কোথায় যাবেন?

—বাঁকড়োয়।

—সেখানে থাকার জায়গা আছে আপনার?

সুমিত্রা মাথা নাড়লেন, আছে।

ভদ্রলোকের চোখে কৌতূহলের আভাস দেখা গেল যেন।—কোথায় বলুন তো?

বলতে হল। কিন্তু বান্ধবীর দিদিটি যে ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেছেন সেটা আর ভাঙলেন না। আজ যদি না-ই ফেরেন আশ্রয়ের জন্য তাঁর কোনো সহকর্মিণীর কাছে ধর্ণা দিতে হবে হয়তো। এ-সব ছোট-খাট দুশ্চিন্তা নিয়ে সুমিত্রা সরকার মাথা ঘামান না।

পুষ্ট কব্জির দামি রিস্ট ওয়াচে সময় দেখে মঙ্গল ঘোষ অন্তরঙ্গ আহ্বান জানালেন, তা হলেও আসুন, আপনার বাস ছাড়তে এখনো তিন ঘণ্টা দেরি—একটু রেস্ট-টেস্ট নিয়ে লাইব্রেরিটাও দেখে যান। বাবার লাইব্রেরি বড় বটে, কিন্তু কি আছে না আছে সেখানে আমিও জানি না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বলতে গেলে বন্ধই থাকে ওটা। আসুন—

স্বাভাবিক আমন্ত্রণ। সময় যখন আছে লাইব্রেরি দেখার লোভও আছে সুমিত্রার। ভদ্রলোক যেদিকে পা বাড়ালেন সেদিকেই পাথরের ওপর তাঁর সুটকেস। ভালুকটার পাশ কাটাতে গিয়ে আবার

গায়ে কাঁটা দিল। সকলের অগোচরে কি অঘটন ঘটে যেতে পারত ভাবা যায় না। আর কেউ হলে কতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতো ঠিক নেই। সুমিত্রাও কম কৃতজ্ঞ নন, কিন্তু তাঁর মুখে অত কথা আসে না।

তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে পাথরের ওপর থেকে সুটকেসটা তুলে নিয়ে আসতে মঙ্গল ঘোষ অবাক একটু। বললেন, যেখানে উঠেছেন সেখানে না রেখে বাঁকড়ো থেকে এটাও বয়ে এনেছেন নাকি।

সুমিত্রা এবারে বিপন্ন বোধ করলেন একটু। সত্যি কথাটাই বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। বললেন, বন্ধুর দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি, তিনি ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেছেন জানা ছিল না। আজই সন্ধ্যায় ফেরার কথা।

—ও···। এক হাতে বন্দুক, অন্য হাত বাড়ালেন মঙ্গল ঘোষ। —ওটা আমাকে দিন।

না, না বলে বাধা দেবার আগে সুটকেসটা টেনেই নিলেন ভদ্রলোক। হাতে তাঁর মোটা মোটা আঙুলের ছোঁয়া লাগল। অগত্যা ছেড়ে দিলেন।

পাশাপাশি চলতে চলতে ঈষৎ হালছাড়া বিরক্তির সুরে মঙ্গল ঘোষ বললেন, আমাদের সরকার বাবুরও তেমনি বুদ্ধি, কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ না করেই আপনাকে বিদায় করেছে বোধহয়?

—না, কেউ নেই শুনে আমিই চলে এসেছি।

—বাসের সময় পর্যন্ত বাড়িতে অপেক্ষা করলে এ-রকম বিভ্রাটে পড়তে হত না।

বিভ্রাটের কথায় আবার গায়ে কাঁটা দিল সুমিত্রার। কি বিভ্রাটই না হতে পারত। ভিতরে ভিতরে কৌতূহলও হল একটু। তাছাড়া মুখ বুজে চলাটাও অস্বস্তিকর। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ছ'দিন আগে শিকারে বেরিয়েছিলেন শুনলাম, এইভাবে শুধু একটা বন্দুক হাতে নাকি।

মঙ্গল ঘোষ শব্দ না করে হাসতে লাগলেন। বললেন, না

একজনের জিপ নিয়ে গেছলাম। সঙ্গের জিনিস-পত্র সব এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। দূর থেকে আপনাকে পাহাড়ের ওই পিছন দিকে একলা বেড়াতে দেখেই নেমে পড়েছিলাম। যারা জানে তারা একলা খালি হাতে এ-দিকটায় আসে না বড়ো। এ-দিকে খুব বেশি রকম ভালুকের উৎপাত।...কিন্তু আপনি খুব ঘাবড়েছিলেন, ভেবেছিলেন আপনাকেই নিশানা করছি।

অব্যর্থ নিশানায় প্রথম গুলীতে ভালুক খতম করার পর বন্দুকের নলটা যে ঘাবড়ে দেবার জন্যেই তাঁর দিকে ঘুরেছিল এ কথাটা সুমিত্রা আর বলতে পারলেন না। প্রাণ বাঁচানোর পর ওটুকু রসিকতা অপুরুষোচিত নয়। আর এই থেকে মানুষটার স্নায়ুর জোরও অনুভব করা যায়।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, চিঠিতে দেখলাম আপনার প্রোফেসার লিখেছেন আপনি খুব বড় স্কলার, কাব্য-সাহিত্য বলতে আপনার সাবজেকট বাংলা?

—সংস্কৃত।

শুনে বিস্মিত একটু।—সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রস নিয়ে রিসার্চ করছেন?

মুখে লালের আভা একটু। সুমিত্রা মাথা নাড়লেন। রস বলতে কি ভাবা হচ্ছে কে জানে।

একটু বাদে মঙ্গল ঘোষ হাসতে লাগলেন। বললেন, আমি মেয়ে স্কলার কখনো দেখিনি। তাঁদের সম্পর্কে আমার অন্য রকম ধারণা ছিল।

সুমিত্রা তাকালেন তাঁর দিকে। কি রকম ধারণা ছিল চোখে সেই জিজ্ঞাসা।

হাসতে হাসতেই মঙ্গল ঘোষ আবার বললেন, আমি ভাবতাম রোগা সিঁটকে চেহারা হবে, চোখে পুরু লেন্সএর চশমা থাকবে, এই গোছের আর কি...

সুমিত্রা সরকারের ফর্সা গালে লালের ছোপ লাগল আবার। স্বল্পক্ষণের পরিচিত হলেও একটু আগে যে মানুষ প্রাণরক্ষা করেছেন তাঁর মুখে একথা শুনে কৌতুকই বোধ করছেন। হাসছেন অল্প অল্প।

আর খানিক এগিয়ে মঙ্গল ঘোষ বললেন, আপনি তাহলে সংস্কৃততে এম-এ? রিসার্চ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই বলেই এ-রকম প্রশ্ন।

সুমিত্রা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তাই।

—আর বড় স্কলার বলতে ফার্স্ট ক্লাস নিশ্চয়?

সলজ্জ মুখে আবারও মাথাই নাড়লেন শুধু। রেকর্ড মার্কস পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যে সে আর মুখ ফুটে বলতে পারলেন না।

এই শুনেই বড় একটা নিঃশ্বাস পড়ল মঙ্গল ঘোষের।—বাবার ভয়ে আমি ঘষে-মেজে কোনরকমে পাস কোর্সএ বি-এটা পাস করেছিলাম। তার আগে ওই সংস্কৃতর জন্যেই একবার আই-এ ফেল করেছিলাম। আমার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় বুঝতেই পারছেন।

এই সরল উক্তিও সুমিত্রা সরকারের ভালো লেগেছে। তাঁর জবাবটুকুও উপভোগ্য। বলেছেন, ভালুক এম. এ বা ফার্স্ট-ক্লাসটাস চেনে না, বন্দুক চেনে।

বেশ গলা চড়িয়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন মঙ্গল ঘোষ। তাঁরও ভালো লেগেছে। অদ্ভুত ভালো লাগছে। মাত্র এইটুকু দেখে, মাত্র এই ক'টা কথা শুনে এক মেয়েকে এত ভালো লাগে কি করে, কেন লাগে—তিনি জানেন না।

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো চাকর আর সেই আধবয়সী চাকরের ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। আগে জিপ আসার ফলে প্রভুর আগমন সংবাদ তারা আগেই পেয়েছিল।

হাতের বন্দুক আর স্যুটকেস সরকারের হাতে দিয়ে মঙ্গল ঘোষ বললেন, বয়েস তো হয়েছে, মগজের বুদ্ধি আর একটু খরচ-টরচ করো।

কি অপরাধ ভালো করে না বোঝার আগেই কাঁচুমাচু মুখ সরকার বাবুর। কিন্তু আসলে তার ওপর একটুও বিরূপ নন মঙ্গল ঘোষ। সে বেশি বুদ্ধিমান হলে জীবনের একটা বড় সুযোগই নষ্ট হত যেন।

সুমিত্রাকে সোজা দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দেখালেন তিনি। মহিলা আগে আগে উঠছেন, পিছনে মঙ্গল ঘোষ। অবাধ্য দুই চোখ ওই রমণী দেহে ওঠা-নামা করছে। তেত্রিশ বছরের এই জীবনে খুব একটা সংযমী পুরুষ নন তিনি। দুর্ভর একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য অর্থের বিনিময়ে কখনো সখনো ভোগের রসদ খোঁজেন। কিন্তু সেরকম ভোগে আনন্দের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না শেষ পর্যন্ত। মনের তলায় ক্রুর খেদ জমাট বেঁধে ওঠে। তখন শিকারে বেরিয়ে পড়েন নয়তো ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ান।

কিন্তু আজকের এই অনুভূতিটা শুধুই যেন আনন্দের। দোতলার মহলটা অন্যরকম। সামনে টানা বারান্দা। ঝকঝকে মেঝে। দেয়ালের গায়ে বড় বড় শিকারের ছবি আর হরেক রকমের শিকারের নিদর্শন। নানারকমের হরিণের সিং, হরিণের চামড়া, বাঘের মাথা, ভালুক আর চিতার মাথা আর চামড়া। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতীর দাঁত। এই বারান্দাটাই যেন ছোটখাট মিউজিয়াম একটা। বারান্দার ও মাথায় একটা আস্ত বাঘ দাঁড়িয়ে। জানা না থাকলে আঁতকে উঠতে হবে, মনে হবে জীবন্ত। অন্যদিকে তেমনি একটা বিশাল ভালুক দাঁড়িয়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা সমস্ত বারান্দাটাই ভালো করে দেখে নিলেন একবার। বারান্দার সামনের দিকে পিছনের দিকে সারি সারি ঘর।

বারান্দাতেই বসার সোফা সেট আছে একপ্রস্থ।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।—এ সবই আপনার শিকার নাকি? -

মৃদু হেসে মঙ্গল ঘোষ জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমি যাকে বলে এক নম্বরের পাষণ্ড। দু-একটা ঘরে আরো কিছু আছে, দেখবেন?

সুমিত্রা মাথা নাড়লেন, থাক, এইতেই গা ছমছম করছে।

—বসুন তাহলে। আগে এক পেয়ালা চা, তারপর মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ, তারপর আপনার কাজ। লাইব্রেরি ঘর খুলতে বলেছি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেও সময় লাগবে একটু।

চা খেতে খেতেও সুমিত্রা সরকার শিকারের নিদর্শনগুলিই দেখছেন। এতগুলো জানোয়ার এই লোকের হাতে মারা পড়েছে ভাবতে খুব একটা ভালো লাগছে না। ঘরে আরো আছে নাকি। আবার তক্ষুনি মনে হল, ভদ্রলোক অমন দক্ষ শিকারী না হলে আজ তাঁর প্রাণে বাঁচার আশা ছিল না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মঙ্গল ঘোষ তাঁকেই দেখছেন উৎসুক নেত্রে। চোখোচোখি হতে সামাল দিতে চেষ্টা করলেন।—আপনি কতদিন হল এই রিসার্চ করছেন?

—চার বছর চলছে।

—তার মানে আপনি এম-এ পাস করেছেন আরো চার বছর আগে? গলার স্বরে ঈষৎ বিস্ময়।

সুমিত্রা মাথা নাড়লেন। তাই।

মঙ্গল ঘোষ মনে মনে একটু হিসেব করে নিলেন।...সতের আঠের বছরে যদি ম্যাট্রিক পাস করে থাকেন মহিলা তাহলে এম-এ পাস করতে তেইশ চব্বিশ। আর এখন তাহলে বয়েস সাতাশ আটাশ। বাইশ তেইশের বেশি দেখায় না।...এ-রকম যার বিদ্যে আর এই যার চেহারা সেই মেয়ে এত বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিতা কেন ভেবে পেলেন না।...প্রোফেসারের চিঠিতে দেখেছেন নাম মিস সুমিত্রা সরকার।

হাত মুখ ধুয়ে বেশ ভালো রকমের জলযোগ সেরে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ বেলা তখন চারটে।

লাইব্রেরি দেখার জন্য হাতে বড় জোর দেড় ঘণ্টা সময় তাঁর। বিকেল ছ'টায় শেষ বাস ছেড়ে যায় শুশুনিয়া থেকে।

কি আছে না আছে বড় জোর ঘুরে দেখা হবে একবার। সুমিত্রার সেটুকু লোভও কম নয়।

সত্যিই মস্ত লাইব্রেরি। বিরাট এক একটা আলমারিতে নানা রকমের প্রাচীন গ্রন্থ ঠাসা। বিভিন্ন ধর্মের বই, তন্ত্রের বই, বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে বহু পৌরাণিক কাহিনী। প্রথম আলমারির সামনে দাঁড়িয়েই সুমিত্রা তন্ময় হয়ে দেখছেন। এতবড় হল ঘরে আরো বিশাল বিশাল আলমারি বোঝাই ওই রকমের বই। একটা মাস সময় পেলেও সুমিত্রার এই সব ভালো করে দেখা হবে কিনা সন্দেহ।

সামনের আলমারি থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে সশ্রদ্ধ সুরে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, এই সবই আপনার বাবার কালেকশন?

মঙ্গল ঘোষ জবাব দিলেন, বাবার বাবা আর তাঁর বাবা থেকে শুরু—বাবাতে এসে থেমেছে। আমার আমল থেকে নষ্ট হবার পালা। বই-পত্রর গায়ে কেমন ধুলো জমেছে দেখছেন না।

সুমিত্রার মুখ দেখে মনে হল এরকম সম্ভাবনাটা যেন বেদনার কারণ তাঁর। বলে ফেললেন, নষ্টই যদি হয় এত সব দামী কালেকশন ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা এসিয়াটিক সোসাইটির মতো কোনো ভালো জায়গায় দিয়ে দেন না কেন?

মঙ্গল ঘোষ মনে মনে বললেন, দিয়ে দিলে এই দেখাটা আজ হত কি করে। মুখে বললেন, আমার জ্ঞানবুদ্ধি আর চরিত্র বোঝার পর বাবার হয়তো মনে মনে সেই রকমই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় পেলেন না...বয়েস অনুযায়ী খুব শক্ত সমর্থ ছিলেন, হঠাৎ মারা গেলেন।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাঁর একমাত্র ছেলে?

—হ্যাঁ, তিন বছর বয়সে আমার মা মারা যান, তাই আমিই সবে ধন নীলমণি।

জবাবের মধ্যে কিরকম যেন প্রচ্ছন্ন চপলতা আছে। যেন বলতে চান, অমন অসময়ে মা মারা না গেলে বাবার আরো সন্তানাদি থাকতে পারত। ওই বাপের প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধাই হল সুমিত্রার। অঢেল পয়সা থাকা সত্ত্বেও অসময়ে স্ত্রী মারা যাবার পর আর বিয়ে থাওয়া না করে শাস্ত্র আর পুরাণ চর্চা করে কাল কাটিয়ে গেছেন মনে হয়। বললেন, আপনার বাবাও মস্ত পণ্ডিত মানুষ ছিলেন নিশ্চয়···

—ঠিক জানি না, লোকে তাই বলে।

ঈষৎ বিস্ময়ে সুমিত্রা একবার মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। বাপের সম্পর্কে ছেলের এমন নিস্পৃহ উক্তি আশা করেন নি।

হাতের বই আলমারিতে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, পুঁথির কালেকশান কোন দিকে?

বিপন্ন মুখ মঙ্গল ঘোষের। লাইব্রেরির চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলেন, বলতে পারব না, আছে কি নেই তাও জানি না···আপনাকেই দেখে নিতে হবে।

সুমিত্রা সরকার একটুও খুশি হলেন না। যে-রকম সমজদারের হাতে পড়েছে এ লাইব্রেরির পরমায়ু কতদিন আর। পিতৃপুরুষের আদরের জিনিসের প্রতি একটু মায়ামমতাও থাকে লোকের—এঁর তাও যেন বিন্দুমাত্র নেই।

হাতে সময় খুব বেশি নেই। বই ঘাঁটতে গেলে কাজের জিনিস কি আছে না আছে দেখারও সময় হবে না। এক চককর ঘোরা শেষ হবার আগেই একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। নানা আকারের পুঁথি সেখানে। সানন্দে বলে উঠলেন, এই তো অনেক পুঁথি!

পিছনে দাঁড়িয়ে মঙ্গল ঘোষও ওগুলো নতুন করে দেখলেন যেন। মন্তব্য করলেন, আরো অনেক ছিল শুনেছি, পিতৃপুরুষদের চিতার সঙ্গে গেছে।

শুনে সুমিত্রা হতভম্ব।—চিতার সঙ্গে পুঁথি গেছে।

মঙ্গল ঘোষ হেসে জবাব দিলেন, সেই রকমই রীতি ছিল জানেন না বুঝি! চিতার সঙ্গে পুঁথি দিলে আত্মার মঙ্গল। আমার বাবার চিতাতেও বুড়ো শুভার্থীরা দু-একখানা পুঁথি চিতায় ফেলেছিলেন মনে আছে। আবারও হাসলেন।—আপনার রসের জিনিসগুলোই গেছে কিনা দেখুন।

ভাবতেও বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে ওঠে সুমিত্রার। আলমারি খুলে খুব সন্তর্পণে একখানা ভূর্যপত্রে লেখা লাল কাপড়ের মলাটে বাঁধানো পুঁথি বার করলেন। এক জায়গায় বসে খুব সাবধানে দেখতে হবে, নইলে আঙুলের সামান্য চাপেও পাতা গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। এদিক-ওদিক তাকাতেই মঙ্গল ঘোষ তাড়াতাড়ি ছোট একটা টেবিল আর একটা চেয়ার আলমারির সামনে পেতে দিলেন।

সেই চেয়ারে বসে আর পুঁথি টেবিলে রেখে সুমিত্রা খুব সাবধানে খুললেন। ঠিক তাঁর বিষয়গত পুঁথি নয় সেটা।

গৃহস্থালি চর্চা বিষয়ক। তবু এরই মধ্যে তাঁর অনুসন্ধানের বস্তুর ছিটেফোঁটা থাকা অসম্ভব নয়।

হিজিবিজি কিম্ভূতকিমাকার লেখাগুলোর প্রতি অত মনোনিবেশ দেখে মঙ্গল ঘোষ যথার্থই অবাক। স্কলার এবং সংস্কৃতে এম-এ জেনেও যেন বিশ্বাস হয় না এ কেউ পড়তে পারে। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ওই লেখা সব পড়তে পারছেন নাকি?

সামান্য হেসেই মাথা নাড়লেন সুমিত্রা। পারছেন।

—পড়ুন তো একটু শুনি।

হাসি মুখেই সুমিত্রা গোটা কয়েক লাইন পড়ে গেলেন। অর্থ একবর্ণও বোধগম্য হল না মঙ্গল ঘোষের। কিন্তু কানে অদ্ভুত মিষ্টি লাগল নিখুঁত উচ্চারণের ওই কণ্ঠস্বর।

ঘর ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। রমণীর ওই পাঠরত নিবিষ্ট

ভঙ্গিটুকুও যেন দু'চোখ ভরে দেখার মতো। কিন্তু সঙএর মতো দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না।

—আচ্ছা আপনি দেখুন, আমি ততক্ষণে একটু নিজের কাজ সারি।

নিজের কাজ বলতে বন্দুক-টন্দুকগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা। কিন্তু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসার পর কিছুই আর ভালো লাগল না। নিজের ঘরে এসে সটান শয্যায় শুয়ে পড়লেন। সুমিত্রার প্রোফেসারের লেখা চিঠিখানা আর একবার চোখের সামনে খুলে ধরলেন। তারপর বিমনা।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় লাইব্রেরি ঘরে এলেন আবার। সুমিত্রা নিবিষ্ট মনে আর একটা পুঁথি পড়ছেন। আগের পুঁথিটাও সামনের টেবিলে পড়ে আছে। পায়ে পায়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে এলেন মঙ্গল ঘোষ। বিশ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু মহিলা টেরও পেলেন না। স্থানকাল ভুলে পড়ে চলেছেন। মঙ্গল ঘোষের নির্দেশে সরকারবাবু আর এক পেয়ালা চা ওই টেবিলে রেখে গেছে। কিন্তু চা-সুদ্ধ পেয়ালা তেমনি পড়ে আছে। মুখ তুলে দেখার বা খাওয়ার ফুরসৎ মেলেনি।

মঙ্গল ঘোষ দাঁড়িয়ে অপলক চোখে এই নিবিষ্টতা দেখলেন খানিক। তারপর খুব সচেতনভাবেই একটা অনুচিত কাজের প্রশ্রয় দিলেন তিনি। এই নিবিষ্টতায় ছেদ না ঘটিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

চুপচাপ নিজের ঘরে অপেক্ষা করছেন আর থেকে থেকে ঘাড় দেখছেন।...পৌনে ছ'টা...ছ'টা তারপর এক সময় সাড়ে ছ'টা।

বাঁকুড়ার লাস্ট বাস ঘড়ি ধরে ঠিক ছ'টায় শুশুনিয়া থেকে ছেড়ে যায়।

ঘরের দরজার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন মঙ্গল ঘোষ। আরো আট দশ মিনিট কেটে গেল। বারান্দার শেষ মাথার কোণের

ঘরের দিকে চেয়ে আছেন মঙ্গল ঘোষ। সেটাই লাইব্রেরি। সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। দাঁড়িয়েই আছেন।

হন্তদন্ত হয়ে সুমিত্রা লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরুবামাত্র মঙ্গল ঘোষও সেই দিকে এগোলেন।

দুজনে কাছাকাছি হতে দুশ্চিন্তা ছাওয়া ব্যস্ত মুখে সুমিত্রা বললেন, পৌনে সাতটা বাজে, লাস্ট বাস তো ছ'টায় ছেড়ে যায় শুনেছি।

মঙ্গল ঘোষ মিথ্যে কথা সচরাচর বলেন না। কিন্তু এখন অম্লান বদনে বলে ফেললেন, খুব টায়ার্ড ছিলাম, বিছানায় গা দিতেই দু'চোখ কখন লেগে এলো। হঠাৎ সজাগ হয়ে ঘড়িতে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি দেখতে এসেছিলাম আপনি চলে গেলেন কিনা।

সুমিত্রার অসহায় মুখ।—পুঁথি নিয়ে বসে আমার আর সময়ের দিকে খেয়ালই ছিল না। বাঁকড়ো যাবার বাস-টাস এখন আর কিছুই পাওয়া যাবে না?

জবাব দেবার আগে দেখা গেল সরকারবাবু আসছে এদিকে। গম্ভীর মুখে মঙ্গল ঘোষ তাকে বললেন, এঁর ছ'টায় লাস্ট বাস ধরার কথা ছিল আপনি জানতেন না?

সে আমতা আমতা করতে লাগল।—আজ্ঞে আমি তো ঠিক···

তাকে থামিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এঁর বাঁকড়ো যাওয়ার কি ব্যবস্থা হতে পারে?

সরকারবাবু বিশ বাঁও জলে পড়ল যেন। জবাব হাতড়ে পেল না।

সুমিত্রা বললেন, একটা ট্যাক্সিও যদি···

মঙ্গল ঘোষ চুপ। অগত্যা সরকারবাবুই বলল, আজ্ঞে ট্যাক্সি তো এখানে বাইরে থেকে সোয়ার নিয়ে দু'একটা আসে আবার সন্ধ্যার আগেই সোয়ার নিয়ে চলে যায়, জঙ্গলের পথ তো···

মঙ্গল ঘোষ বললেন, আর আছে সাইকেল রিকশ কিন্তু সে-ব্যাটারা ওই জঙ্গলের রাস্তায় রাতে ছেড়ে দিনের বেলাতেও আঠের-

বিশ মাইল পথ ঠেঙায় না।...যাক, একেবারে জলে পড়ে গেছেন, ভাববেন না, আমি আশা করছি এই একটা রাত থেকে যেতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। সরকারবাবুকে নির্দেশ দিলেন, লাইব্রেরির পরের ঘরটায় এঁর থাকার ব্যবস্থা করে দাও, আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও নিজে দেখেশুনে কোরো—

অস্বস্তির এক শেষ, সুমিত্রা কি করবেন বা কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

—আবার লাইব্রেরিতে চলুন, এখন যা দেখার ধীরে সুস্থে দেখতে পারবেন। কাল সকালে তো আবার আসতেই হত, একটা রাত না-হয় এই গরিবখানাতেই কাটালেন।

অগত্যা লাইব্রেরিতে ঢুকে আবার সেই পুঁথির টেবিলেই বসতে হল। মঙ্গল ঘোষ বললেন, পড়ুন, সাড়ে ন'টায় খাবার-ডাক পড়ার আগে আর আপনাকে ডিসটার্ব করব না।

বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু মনোযোগে এরকম বিতিকিচ্ছিরি ছেদ পড়ার ফলে পুঁথিতে আর তেমন করে নিবিষ্ট হতে পারছেন না সুমিত্রা। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল এ একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল। আজ বিকেলে বাড়ির এই মালিকটিই তাঁর প্রাণরক্ষা করেছেন ভেবেও অস্বাচ্ছন্দ্য গেল না।

রাত আটটা পর্যন্ত পুঁথি নাড়াচাড়া করে কাটল। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে, শেয়াল ডাকছে। সুমিত্রার মনে হতে লাগল যেন অনেক রাত। পুঁথিগুলো ভালো করে গুছিয়ে চাপা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। দরজার কাছে সরকারবাবু মোতায়েন। ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো কি চাই খোঁজ নিতে।

—না, কিছু চাই না...উনি কি করছেন?

—বাবু? মোটর-গ্যারাজে তাঁর গাড়ির খোঁজ নিতে গেছেন,

মেরামতে দেওয়া হয়েছিল—বাস-স্টপে গ্যারাজ, ফিরতে বেশি দেরি হবে না। আপনার কাজ হয়ে গেল ?

—আজ আর ভালো লাগছে না।

বারান্দার সোফা-সেটি দেখিয়ে ব্যস্ত মুখে সরকারবাবু বলল, আপনি ওখানেই বসুন তাহলে—

এমন বিশাল বারান্দায় তখন একটা মাত্র আলো জ্বলছিল। আর ওধারের মালিকের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। ফলে বাইরের ঘুটঘুটি অন্ধকার যেন এখানেও ছায়া ফেলেছে। সরকারবাবু তাড়াতাড়ি বারান্দার সব ক'টি আলো জ্বেলে দিতে বারান্দাটা ঝলমল করে উঠল। সুমিত্রা স্বস্তি বোধ করলেন। প্রাসাদের মতো এমন বাড়িতে মাত্র তিনটে প্রাণী নিয়ে মানুষটা বাস করে কি করে ভেবে পেলেন না। এখানকার নির্জনতা এরই মধ্যে যেন বুকের ওপর চেপে বসছে।

সুমিত্রা বসলেন না। দেয়ালের গায়ের জীবজন্তুর নিদর্শনগুলো দেখলেন। বারান্দার ও-মাথার আস্ত বাঘটার দিকে চোখ গেল, জ্যান্ত নয় জানেন, তবু ওটার দিকে তাকালে ভয়-ভয় করে। আর মালিকের ঘর ছাড়িয়ে বারান্দার এ-মাথায় দাঁড়ানো ওই মস্ত ভালুক। সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের সেই ভালুকের ব্যাপার মনে পড়তে এক ধরনের আতঙ্ক। কিন্তু সেই সঙ্গে বিকেলে কি অঘটন ঘটে যেতে পারত সেটা অনুভব করার লোভে ওদিকে এগিয়েও চললেন। তাছাড়া সরকারবাবু সঙ্গে আছে, এত অস্বস্তি বোধ করার কোনো মানে হয় না।

অনেকটা সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বাবু খুব মস্ত শিকারী বুঝি ?···এখানকার এই সব তাঁর নিজের শিকার ?

প্রশ্ন শুনে সরকারবাবু উচ্ছ্বসিত।—সব নিজের। শিকারের অমন হাত শুশুনিয়া ছেড়ে সমস্ত বাঁকড়োতেও আর নেই। আর সেই রকমের চোখ বাবুর···

শিকারের ব্যাপারে চোখের তাৎপর্য কিছুই জানা নেই সুমিত্রার।

তবু ভদ্রলোকের হাসিমাখা চোখ দুটো যে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর গভীর সেটা লক্ষ্য করেছেন।

সরকারবাবু জিজ্ঞাসা করল, ঘর খুলে দেব, আরো দেখবেন?

—না, ওই ভালুকটা দেখব। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলেন। গা শিরশির করছে।

মালিকের ঘর পেরুবার মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘরে নীল আলো জ্বলছে, দরজার সামনে পুরু সৌখিন পরদা ঝুলছে। রমণীর কৌতূহল, পরদাটা সরিয়ে ভিতরে তাকালেন। আর তার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরদাটা ছেড়ে দিলেন।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। কার্পেট পাতা ঘরের পালঙ্কে ধপধপে বিছানা পাতা। পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা গেলাস আর জলের বোতল। তখনো মাথায় আসেনি কিছু। পরমুহূর্তে চোখে পড়েছে কিছু। সামনের কাচের আলমারিতে পরপর চারটে মদের বোতল সাজানো। সবক'টা বোতল থেকেই কিছু কিছু খরচ হয়েছে।

সরকারবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হতে তারও বিড়ম্বিত মুখ। মহিলার এই ধাক্কাখাওয়া মুখের ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে। কারণ বুঝেছে।

সুমিত্রা ভালুকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফিরলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, বসি, আর ভালো লাগছে না।

ফিরে এসে সোফা-সেটটিতে বসলেন। সরকারবাবু আর দাঁড়িয়ে না থেকে পায়ে পায়ে সরে গেল। সুমিত্রার মাথা যেমন পরিষ্কার, চিন্তাশক্তিও তেমনি দ্রুত।...সরকারবাবু নিয়মমাফিক জলের বোতল আর গেলাস সাজিয়ে রেখেছে বুঝতে সময় লাগল না। একা থাকলে রাতের ওই পর্ব এতক্ষণে নিশ্চয় শুরু হয়ে যেত। আজ পরে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই স্তব্ধ পুরীতে আর একটা অনাগত ত্রাস মনের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।...ছ'টার বাস

ধরে তাঁর বাঁকড়োয় ফেরার কথা ভদ্রলোক জানতেন। ক্লান্তির অজুহাতে সময় পেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু সুমিত্রার এখন মনে হচ্ছে ওই মুখে ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও দেখেননি, ঘুমিয়ে পড়ার চিহ্নও না। তাহলে? তাহলে কি মতলবে সুমিত্রার ওই ভুলের সুযোগ নিয়েছেন?

সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসছে তাঁর। সাধারণ ক্ষেত্রে আদৌ ভীতু মেয়ে নন তিনি। প্রবল আত্মপ্রত্যয়েরও অভাব নেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওই একজনও তেমনি বেপরোয়া প্রবল পুরুষ এও যেন সমস্ত সত্তা দিয়েই অনুভব করেছেন তিনি। ওই পুরুষ অত্যাচারী হলে আত্মরক্ষার উপায় কি।

ফটফট চটির শব্দে সচকিত। হাসিমাখা ব্যস্ত মুখে মঙ্গল ঘোষ এগিয়ে এলেন।—আমি ভাবছিলাম এখনো আপনি লাইব্রেরিতে, আজকের মতো কাজ শেষ?

একরকম জোর করেই মুখ তুললেন সুমিত্রা। মাথা নেড়ে সায় দিলেন। মানুষটাকে দেখে নেবার তাড়না বেশি।

সরকারবাবু বলেছিল, শিকারের সেই রকমই চোখ তার বাবুর। কিন্তু ওই চোখ যে কত তীক্ষ্ণ কত সজাগ আর কত অন্তর্ভেদী সুমিত্রার তখনো ধারণা নেই। মঙ্গল ঘোষের তক্ষুনি মনে হল এই একটা ঘণ্টার মধ্যে চেহারাই যেন বদলে গেছে মহিলার। নিষ্প্রভ ফ্যাকাশে মুখ। ভয়মাখা সন্দিগ্ধ চাউনি। হঠাৎ কি হল মঙ্গল ঘোষ ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ পরিশ্রম করে হঠাৎ শরীর খারাপ হল নাকি?

…না, ক্লান্ত লাগছে।

—তাহলে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ঘরে পা দিতেই যেন ষষ্ঠ চেতনায় ঘা পড়ল একটা। টেবিলের ওপর জলের বোতল

আর গেলাস, আলমারিতে ওই বোতলগুলো আর ওদিকে মহিলার হঠাৎ অমন বিবর্ণ মূর্তি আর সন্দিগ্ধ চাউনি। বাতাস টেনে শিকারের গন্ধ পান তিনি আবার চকিতে অনেক কিছু সম্ভাবনারও ইঙ্গিত পান।

তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালেন। সুমিত্রা স্থির নেত্রে এদিকেই চেয়ে আছেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। বারান্দাতেই টেবিল পেতে দুজনের খাবার দেওয়া হল। ব্যবস্থা এরই মধ্যে কম করেনি সরকারবাবু। কিন্তু সুমিত্রার আহারের রুচি গেছে। সামান্যই খেলেন। মঙ্গল ঘোষ যেন ইচ্ছে করেই কথা বলছেন না। নীরবতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে দু'একবার মুখ তুলে তাকালেন সুমিত্রা। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখলেন। আর মনে হল অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারীর হাসি-ছোঁয়া গভীর দুটো চোখ দেখলেন। সেই গভীরে কি আছে চোখে চোখে রেখে সেটা আর দেখে উঠতে পারলেন না।

মুখ-হাত ধোয়া হতে মঙ্গল ঘোষ ডাকলেন, আসুন—

তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দরজার সামনে এসে বললেন, নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ুন গে।

সুমিত্রা সোজা মুখের দিকে তাকালেন এবার। গলার গম্ভীর স্বরে যেন কৌতুকের মিশেল আছে। আশঙ্কায় বুকের তলায় আর এক দফা কাঁপুনির মতো। কথাটা বলেই মঙ্গল ঘোষ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুমিত্রা [illegible] মতো দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। তারপর ঘরে ঢুকে গেলেন।

সেকালের শক্তপোক্ত দরজা। বন্ধ করলেন। ওপরে নিচের লম্বা লম্বা ছিটকানি লাগিয়ে দিলেন। তারপর লক্ষ্য করলেন, দরজা ভিতর থেকে না খুললে এই পেল্লায় দরজা না ভেঙে কারো ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। জানালার গরাদগুলোও তেমনি মজবুত। ঘরের

চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা।

কিন্তু শোবার পরেও একটা অস্বাচ্ছন্দ্য মনের তলায় থিতিয়ে থাকল। সেটা বাড়ছে বই কমছে না।…এবারে বোধহয় মদ নিয়ে বসেছে ওই মানুষ। মদ গেলার পর তাদের আচরণ ঠিক কেমন হয় তাঁর জানা নেই। কিন্তু পথেঘাটে কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত মাতাল কখনো দেখেননি এমন নয়।

শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছেন। চোখের ত্রিসীমানায় ঘুম নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। কোথাও একটু শব্দ হলেই চমকে ওঠেন। মনে হয় এই বুঝি বন্ধ দরজায় কোনো প্রমত্ত মানুষের করাঘাত পড়ল।

জানালার ভিতর দিয়ে ভোরের আলোর আবছা আভাস জাগল একসময়। সুমিত্রার দু'চোখে ঘুম নেমে এলো এতক্ষণে।

যথার্থই কৌতুক বোধ করেছিলেন মঙ্গল ঘোষ। হ্যাঁ তাঁর এই দু'চোখ মানুষেরও বুকের তলার সন্ধান নিতে জানে। সরকারবাবুকে ঘরে ডেকেছেন। সোজা জিজ্ঞাসা করছেন সুমিত্রা দেবী কি সন্ধ্যায় এ-ঘরে এসেছিলেন, না সমস্ত ক্ষণ বারান্দাতেই বসেছিলেন?

আমতা আমতা করে সরকার জবাব দিল, ওই ভালুকটা দেখতে গিয়ে এ-ঘরের পরদা সরিয়েছিলেন।

—ঠিক আছে, যাও।

তাঁর হাসিই পাচ্ছে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসলেন সুমিত্রা। বাইরের দিকে চেয়ে দেখেন বেশ বেলা। শয্যা থেকে নেমে দরজা খুললেন। সরকারবাবু দাঁড়িয়ে। বললেন, বাবু চায়ের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ আপনার জন্য বসে আছেন।

আমি এক্ষুনি আসছি।

ঘরের মধ্যেই অ্যাটাচড বাথ। মিনিট পনেরর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে

বেরিয়ে এলেন। রাতের ভয়ভাবনা দিনের আলোয় উবে গেছে। ওই রকম ত্রাস হয়েছিল বলে লজ্জাই করছে এখন। সবসুদ্ধ দু'ঘণ্টাও ঘুম হয়নি, চোখ দুটো জ্বালাজ্বালা করছে।

—আসুন। চায়ের টেবিলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন মঙ্গল ঘোষ।—রাতে ভালো ঘুম হয়নি নিশ্চয় ?

হাসতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা।—না···অপরিচিত জায়গা।

ঠাট্টার সুরে মঙ্গল ঘোষ বললেন, তাছাড়া বাড়ি যার সে-ও অপরিচিত।

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন সুমিত্রা। মনে হল গত রাতে মানুষটা তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন।

—আজ লাইব্রেরির কাজ করছেন তো ?

সুমিত্রা সপ্রতিভ জবাব দিলেন, আজই তো সত্যিকারের কাজ আরম্ভ করব, বিকেলের আগে যাচ্ছি না কিন্তু। গত রাতের সেই ভয় এই দিনের আলোয় লজ্জার কারণ।

মঙ্গল ঘোষ স্থির ফয়েসলার মতো করেই ঘোষণা করলেন, বিকেল পর্যন্ত নয়, সন্ধ্যার পরে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে—বিকেলের আগেই আমার গাড়িটা পেয়ে যাব, আর তারপর আপনাকে একটা লিফট্ দেবার সুযোগ ছাড়ি কি করে ?

সময় নষ্ট না করে সুমিত্রা কাজে বসে গেছেন। এতগুলি পুঁথি ভালো করে একবার উল্টে-পাল্টে দেখতে হলেও সময় কত লাগবে ঠিক নেই। তারপর নোট-টোট করতে হলে তা কয়েক দিনের ধাক্কা। লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য বই কি আছে না আছে তাও দেখে নেবার লোভ। কিন্তু এ যাত্রায় আর বড় জোর তিন-চার দিন তিনি বাঁকড়োয় থেকে যেতে পারেন। জিনিসের সন্ধান পেলে এটুকু সময় কিছুই নয়।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার আগে পর্যন্ত মঙ্গল ঘোষ আর লাইব্রেরি

ঘর মাড়ালেন না। যদিও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকবার লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছেন, কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গবেষণারত মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু এই লোভও সংবরণ করেছেন।

দুপুরে খাবার সময় জিজ্ঞাসা করেছেন, পেলেন কিছু?

সুমিত্রা হেসে জবাব দিয়েছেন, দেখে যাচ্ছি।

আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পরেই তিনি আবার লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বিকেলের চায়ের তাগিদ দিতে গিয়ে সরকারবাবু ফিরে এলো। মনিবকে জানালো, উনি একমনে লিখছেন কি, মুখ তুলে তাকাচ্ছেনও না। দ্বিতীয় বার তাগিদ দিতে গিয়ে ফিরে এসে জানালো, একটুও খিদে নেই, এক পেয়ালা চা শুধু ঘরে দিয়ে আসতে বললেন।

রাতের খাওয়া চুকিয়ে বেরুতে প্রায় আটটা বাজল। এ-জন্য সুমিত্রাই দায়ী। কাল যেমন ঘড়ি দেখতে ভুলেছিলেন, আজও অনেকটা তাই। তবে আজ নিশ্চিন্ত ছিলেন, গাড়িতেই যাবেন যখন হলই বা একটু দেরি। একটা পুঁথিতে প্রোফেসারের মুখে অনেক শোনা একটা বাণী পেয়েছেন, আনন্দং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ, অর্থাৎ ব্রহ্মকেই আনন্দ বলে জেনো। এই আনন্দই রস। এ-রস অসীমের দিকে এগোলেই ব্রহ্ম। এটা ঠিক কাব্য-সাহিত্যে রসের অন্তর্গত বিষয় নয়। তারও ওপরের ধাপ বলা যেতে পারে। তাই কি আছে না আছে দেখার কৌতূহল সামলাবে কি করে। উঠি-উঠি করেও দেরিই হয়ে গেল।

সড়কের পথ শেষ হয়ে দু'পাশে জঙ্গলের মাঝখানের পথ ধরে গাড়ি চলেছে। সুমিত্রা খুশি মুখেই বলেছেন, আপনাকে দিনকতক জ্বালাতন না করে উপায় নেই, কালও সকালের বাস ধরেই চলে আসতে চেষ্টা করব।

সামনের দিকে চোখ রেখে মঙ্গল ঘোষ বললেন, জ্বালাতনটা এখানে থেকে করতে পারলেই ভালো হত, রোজ এই যাতায়াতের ধকল···

এ কথার আর জবাব কি দেবেন সুমিত্রা।

ছু'পাশের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলেছে। ছুজনেই চুপচাপ। সামনে হেড লাইটের আলো। ছু'দিকে ঘন অন্ধকার। তাকালে বেশ গা ছমছম করে। এতক্ষণে কি মনে পড়ল সুমিত্রার। ঘুরে তাকালেন।—আপনাকে তো এই রাতেই ফিরতে হবে আবার?

অল্প হেসে মঙ্গল ঘোষ ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, বোধহয়। কেন?

সুমিত্রা যথার্থই অপ্রস্তুত।—ছি ছি আমার একটুও খেয়াল ছিল না, আপনিও বললেন আর আমিও স্বার্থপরের মতো রাজি হয়ে গেলাম—বাসে এলেই হত।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, এ-রকম যাতায়াতে অভ্যেস আছে, আমার জন্যে ভাববেন না।

কিন্তু ভাবনার কারণ ওপরঅলা কিভাবে ঘটিয়ে রেখেছে ছুজনের কারোর জানা ছিল না। প্রায় মাঝামাঝি পথ পার হওয়ার পর গীয়ার টানতে গিয়ে খট করে শব্দ হল একটা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ছুটো শব্দ নির্গত হল মঙ্গল ঘোষের গলা দিয়ে। এই মেরেছে—

সুমিত্রা সভয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। কি ব্যাপার বুঝে উঠলেন না, গাড়ি চলছে তখনো। মঙ্গল ঘোষ স্টিয়ারিং সংলগ্ন রডের মতো জিনিসটা ধরে ওঠাতে চেষ্টা করছেন আবার নামাতে চেষ্টা করছেন। জঙ্গলের ঘোরানো প্যাঁচানো পথ, একটা বাঁকের মুখে আসার আগে গাড়ির গতি শিথিল হল, তারপর থেমেই গেল।

হেড লাইট জ্বালানোই আছে। পিছনের সীট থেকে হাত বাড়িয়ে বড় টর্চটা নিয়ে মঙ্গল ঘোষ আবার গীয়ার পরখ করলেন। তারপর ওই টর্চ জ্বেলে ড্যাশবোর্ডের খুপরি খুলে খুঁজতে লাগলেন কি। পেলেন না বোঝা গেল। টর্চ হাতে নেমে এলেন তিনি, পিছনের ক্যারিয়ার খুলে সেখানেও খুঁজলেন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে পিছনে হেলান দিয়ে মস্ত নিঃশ্বাস ছাড়লেন একটা।

সুমিত্রা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল···?

—গীয়ারের জয়েন্ট ভেঙে গেল।

গীয়ার কাকে বলে জয়েন্ট কাকে বলে সুমিত্রার ধারণা নেই। বলে উঠলেন, গাড়ি আর চলবে না তাহলে?

গলার স্বরে হয়তো এমন কিছু ছিল যার দরুন মঙ্গল ঘোষ অন্ধকারেই তাঁর দিকে ফিরে মুখ দেখতে চেষ্টা করলেন। এ-গাড়িতে ভিতরের আলো নেই। কি বা কতটুকু দেখলেন তিনিই জানেন। ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, না।

সুমিত্রা নিস্পন্দের মতো বসে রইলেন খানিক। তারপর মৃদু স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন, জয়েন্ট ভেঙে থাকলে আপনি কি খুঁজছিলেন?

—এক্সট্রা গীয়ার রড আছে কিনা। নেই।

একটু থেমে আরো ধীর ঠাণ্ডা সুরে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কতটা পথ এসেছি?

টর্চ জ্বেলে মাইল মিটার দেখলেন মঙ্গল ঘোষ।—আধাআধি।

টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকের মুখটাই দেখছিলেন সুমিত্রা। তারপর টর্চ নিভে গেছে। সেই ক'টা মুহূর্তে-র মধ্যেই লোকটার মুখ যেন কঠিন মনে হয়েছে তাঁর। সংশয়ে সন্দেহে ভিতরটা ভরাট হয়ে উঠেছে। কেন যেন ভয় যত না তার থেকে রাগ হচ্ছে বেশি।

—রাতটা তাহলে এই জঙ্গলের মধ্যেই কাটাতে হবে?

—হ্যাঁ! প্রায় নির্লিপ্ত জবাব মঙ্গল ঘোষের। —এদিকে চিতার উপদ্রব আছে, তাছাড়া এই মার্চ এপ্রিলে মহুয়া পাকে তাই এ-সময়ে ভালুকের উপদ্রবও খুব বেশি।

দুজনেই চুপ এবার খানিকক্ষণ। অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে যাচ্ছে সুমিত্রার। এখন তার মনে হচ্ছে, এই অন্ধকারে যেন বড় বেশি ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসে আছেন তাঁরা। মনে হচ্ছে এবারে একটা হাত গায়ের ওপর এসে পড়লে তাঁর কিছু করার নেই। দরজা খুলে

অন্ধকারে নেমে যেদিকে দু'চোখ যায় ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে সুমিত্রার।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পাশের দিকে সোজা ঘুরে তাকালেন। কারণ অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে লোকটা গাড়ির হেডলাইটও বন্ধ করে দিলেন।

অন্ধকারে ভারী গলার কৈফিয়ত কানে এলো। —সমস্ত রাত হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখলে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবে।

সুমিত্রা কিছু ভাবা বা বলার আগেই ওদিকের দরজা খোলার শব্দ। তারপর মানুষটা নামলেন। হাতের টর্চ জ্বেলে পিছনের দু'দিকের কাচ তুলে দিলেন। তারপর বাতাস চলাচলের জন্য সামান্য একটু ফাঁক রেখে সামনের দরজা দুটোরও কাচ তুললেন। শেষে নিজের দিকের সীটের নিচে থেকে টেনে বার করলেন কি। সুমিত্রা দেখলেন হাতে করে স্টার্ট দেবার দুই-মার্কা রড সেটা। ওটা হাতে নিয়ে বাইরে থেকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গাড়ির মধ্যে সুমিত্রা একা। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলেন। টর্চ জ্বেলে ভদ্রলোক রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পাশে ঘাসের ওপর বসলেন। বসে হাতের রড পাশে রাখলেন তারপর টর্চ নিভিয়ে দিলেন।

চার দিক গাঢ় অন্ধকার। মানসিক কারণেই ক্রমে এই অন্ধকার আরো গভীর ভয়াবহ মনে হতে লাগল সুমিত্রার। বাইরে ঝিঁঝির ডাক, শেয়ালের ডাক আর থেকে থেকে আরো কোনো অচেনা জানোয়ারের ডাক কানে আসতে লাগল। গা দিয়ে ঘাম ছুটছে সুমিত্রার। শুধু একটা টর্চ আর রড হাতে বাইরে বসে আছেন যে মানুষটা তাকে ভিতরেও ডেকে আনতে পারছেন না তিনি। এখনো যেন নিঃসংশয় হতে পারছেন না একেবারে।

গভীর রাত পর্যন্তই স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তারপর কখন গা এলিয়ে দিয়েছেন জানেন না। গত রাতেও ঘুম ভালো হয় নি। পিছনে মাথা রেখে আধবসা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভোরের প্রথম আলো জাগার সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসেছেন আবার। দেখেন ওই মানুষ বাইরের শিশির-ভেজা মাটিতে পায়চারি করছেন। এর পরেও মানুষটার দুর্জয় সাহস তিনি অস্বীকার করেন কি করে। ভোরের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব ভয় ভাবনার শেষ। কিন্তু অনুশোচনা দূর করবেন কি করে।···নিজে তিনি গাড়ির মধ্যে রাত কাটালেন, আর ওই লোক খোলা আকাশের নিচে, জঙ্গলের পাশে। তাছাড়া নিজের সন্দেহ ভয়—দিনের আলোয় এগুলোও যেন লজ্জার কারণ।

দরজা খুলে নেমে দাঁড়াতে মঙ্গল ঘোষও দাঁড়িয়ে গেলেন। সেই হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে সঙ্কোচ বাড়ল আরো। তবু পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, খুব সকালের দিকে রোজই কোনো না কোনো পার্টি গাড়ি হাঁকিয়ে শুশুনিয়া বেড়াতে আসে, সে-রকম একটা গাড়ি পেলেই আপনাকে তুলে দেব, শুশুনিয়া থেকে বাস ধরে নেবেন। ···তাদের সঙ্গেও ফিরতে পারেন।

—আর আপনি এই অচল গাড়ি নিয়ে এখানে বসেই থাকবেন?

—না, যে গাড়ি যাবে, তাদের মারফৎ মোটর গ্যারাজে খবর দিলেই তারা গীয়ার রড পাঠিয়ে দেবে। আমার জন্যে চিন্তা নেই।

কিন্তু এ-ব্যবস্থার দরকার হল না। যে গাড়ির প্রথম দেখা মিলল, বাড়তি গীয়ার রড একটা সেই গাড়ি থেকেই জুটে গেল। এ-রকম বিপাকে পড়লে যার গাড়িতে বাড়তি থাকবে সে-ই দিয়ে দেবে।

যন্ত্রপাতি যা দুই একটা দরকার নিজের গাড়িতেই আছে। পনের মিনিটের মধ্যেই পুরনো গীয়ার রড খুলে নতুনটা ফিট করা হল। পুরনো গীয়ার রডের তলার দিকের ভাঙা টুকরোটা দেখিয়ে মঙ্গল ঘোষ বললেন, এই দেখুন কি হয়েছিল।

এই দেখানোর তাৎপর্য অনুভব করতে পারেন সুমিত্রা সরকার। দেখে চুপ করেই রইলেন।

বাঁকুড়ায় পৌঁছে তাঁর নির্দেশ মতো মেয়ে হোস্টেলের দরজায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মঙ্গল ঘোষ প্রথম কথা বললেন।—তুটো দিন খুব তুর্ভোগ গেল আপনার···এরপর কাল আসছেন না কলকাতা পালাচ্ছেন ?

সুমিত্রা ভাবছিলেন ভদ্রলোককে ডেকে নামিয়ে একটু চা-টা খাইয়ে দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু নিজেই তিনি অতিথি এখানে। যাঁর সঙ্গে চেনা তাঁর সঙ্গে এখনো দেখা পর্যন্ত হয়নি। মেয়ে হোস্টেলে একজন ভদ্রলোককে হুট করে ডেকে আনেন কি করে। প্রশ্ন শুনে হেসেই বললেন, আমি তো আরো তিন দিন থাকতে পারি, তিন দিন যাতায়াত করতে পারি—কিন্তু কার যে তুর্ভোগ সেটা ভেবেই সংকোচ হচ্ছে।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, সংকোচ করবেন না তাহলে, আসবেন।

তু'দিনের সমাচার শুনে সুমিত্রার পরিচিতা বান্ধবীর দিদির তু'চোখ কপালে।—তু'তুটো দিন ওই বাড়িতে কাটিয়ে এলে তুমি !

সুমিত্রা সরকার হকচকিয়ে গেলেন। দিদিটি গম্ভীর।—ভালো করোনি, মঙ্গল ঘোষের সুনাম এই বাঁকড়োর লোকেও জানে। যেমন মাতাল তেমনি বেপরোয়া—তোমার বরাত ভালো বলতে হবে—

বরাত কি জন্য ভালো সেটা আর সম্পূর্ণ করলেন না। কিন্তু সুমিত্রার বুঝতে অসুবিধে হল না। ভিতরটা সত্যিই দমে গেল তাঁর। ···ভদ্রলোকের শোবার ঘরের আলমারিতে মদের বোতল সাজানো নিজের চোখেই দেখেছেন। আর বেপরোয়া যে কত সেটা এই মহিলার থেকে বেশিই অনুভব করেছেন। তবু, এই তু'দিনের অভিজ্ঞতার পর ওই লোককে এতটুকু অশ্রদ্ধার মানুষ ভাবতে পারেন নি।

এই দিদিটির মুখে সুমিত্রা আরো কিছু মন্তব্য শুনলেন। মঙ্গল ঘোষের বাপ সর্ব জনের শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই। আর

তেমনি বিদ্বান ছিলেন। শেষের দিকে অমন বাপের সঙ্গেও বনিবনা হয়নি ছেলের। হুট করে মরে না গেলে সমস্ত সম্পত্তি হয়তো বীরশালার এক আশ্রমের ভদ্রমহিলাকেই দিয়ে যেতেন তিনি। ভাগ্য ভালো তাই বিনা নোটিসে বাপ গেল। বাবা মরে যাবার পর মাতৃতুল্য সেই আশ্রমের প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গেও মঙ্গল ঘোষের ব্যবহার ভালো নয়। আশ্রম বলতে গরিব মেয়েদের বিনে পয়সার স্কুল একটা। মঙ্গল ঘোষের বাবাই সেটা করে দিয়েছিলেন। গরিব মেয়েদের কিছু লেখা পড়া আর নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয় সেখানে। বিশ পঁচিশ তিরিশ বছরের জনাকতক মেয়ে আছে মহিলার আশ্রমে। তাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান চলে। ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে এই লোকের ভয়ে নাকি কাঁটা হয়ে আছেন মহিলা।

মন মেজাজ যথার্থই বিগড়ে গেল সুমিত্রা সরকারের। প্রথমে ভাবলেন শুশুনিয়ায় আর গিয়েই কাজ নেই। কিন্তু যে পুঁথির কাজ আধা-আধি করে এসেছেন সেটা অন্তত শেষ করা দরকার। তারপর কালই না-হয় কলকাতা চলে যাবেন। এটুকু স্থির করার পরেও ভিতরটা তিক্ত হয়েই থাকল। কারণ ওই লাইব্রেরিতে জিনিস কিছু আছে মনে হয়, আর কাজের বইও আছে, কিন্তু তাঁর দেখা হল না।

পরদিনও সুটকেস সঙ্গে করেই শুশুনিয়া এলেন, কারণ বিকেলের বাসএ ফিরে সোজা স্টেশানেই উপস্থিত হওয়ার সংকল্প।

কিন্তু বীরশালের জমিদার ভবনে পা দিয়েই কিছুটা বিমূঢ় তিনি। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বসে আছে মাঝবয়েসি একজন স্ত্রীলোক। সরকারবাবু জানালো, বাড়ির মালিক আজই খুব ভোরে হঠাৎ আবার বেরিয়ে পড়েছেন, ফিরতে তিন-চার দিন দেরি হবে। আশ্রমের মা-কে বলে আপনার জন্যেই সেখান থেকে এই স্ত্রীলোকটিকে আনিয়ে রেখে গেছেন। বাবু বিশেষ করে বলে গেছেন আপনি যেন এ ক'টা দিন এখানে থেকেই কাজ শেষ করে যান।

সুমিত্রার বিব্রত মুখ দেখেই সরকারবাবু সানুনয়ে আবার বলল,

আপনি এখানে না থাকলে বাবু আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন—আপনার কোনো অসুবিধে যাতে না হয় আমরা দেখব—

অনিশ্চিত মন নিয়েই লাইব্রেরিতে ঢুকলেন সুমিত্রা। না, বাড়ির ওই মালিকটিকে চেষ্টা করেও ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। তিন চার দিনের জন্য হঠাৎ তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার তাৎপর্য ভালই বুঝতে পারেন। আশ্রমের যে মহিলার সঙ্গে মঙ্গল ঘোষের দুর্ব্যবহারের কথা শুনেছেন, তাঁর সুবিধের জন্য সেখান থেকেই ওই স্ত্রীলোকটিকে এনে রাখা হয়েছে। সুমিত্রার কেন যেন মনে হল বাইরের রটনা আর ভিতরের ঘটনা এক নয়।

নিজের অগোচরে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মন নিয়েই কাজে বসেছিলেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার ডাক পড়তে তবে তন্ময়তা ভেঙেছে। আর এরই মধ্যে যতটা সম্ভব কাজ শেষ করে যাওয়ার আগ্রহও বেড়েছে। এ-ব্যাপারের পরে তিনটে দিন এখানে থেকে না যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

যাদের ওপর তদারকের ভার তাদের আদর যত্নের ত্রুটি নেই। স্ত্রীলোকটির নাম সুশীলা। রাতে তাঁর ঘরেই মেঝেতে শোয়। গল্পও হয় তখন। আজ পনের বছর হয়ে গেল সুশীলা আশ্রমের মায়ের কাছে আছে। আশ্রমের নাম পর্ণালয়। মায়ের নাম অপর্ণা দেবী। মায়ের খুব ইচ্ছে পর্ণালয় অনেক বড় হোক, অনেক অনাথা মেয়ে আসুক, থাকুক, কাজ পাক। কিন্তু টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। এখানকার দাদাবাবু আর একটু গা করলে হতে পারে, কিন্তু তিনি তো সর্বদাই শিকার আর ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত, এখানে আর থাকেন ক'টা দিন।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে সুমিত্রা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমাদের মা দাদাবাবুকে ভালবাসেন খুব?

সুশীলাকে বেশ চতুরই মনে হয়েছে সুমিত্রার। জবাব দিয়েছে,

মা সকলকেই ভালবাসেন, আর দাদাবাবুকে তো বাসেনই। একটু থেমে আবার বলেছে, যারা জানে তারা সকলেই দাদাবাবুকে ভালবাসে, শুধু মেজাজটাই যা খারাপ, নইলে এ-রকম মানুষ হয় না…।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করেছেন, তাহলে আশ্রম বড় হয় না কেন?

সুশীলা জবাব দিয়েছে, দাদাবাবুর মর্জি না হলে তাকে দিয়ে কেউ কিছু করাতে পারে না।

পরদিন সুশীলাকে সঙ্গে করে বিকেলের দিকে পর্ণালয়ের অপর্ণা দেবীর সঙ্গেও দেখা করেছেন সুমিত্রা। পাঁচিল ঘেরা অনেকটা জায়গার ভিতর ছোট ছোট অনেকগুলো তকতকে কুটির। বড় বড় তুটো ছনের ঘরও আছে। সেখানে মেয়েদের স্কুল বসে আর হাতের কাজ হয়। সুমিত্রার সত্যিই ভালো লাগল, আরো ভালো লাগল অপর্ণা দেবীকে। বছর পঞ্চান্ন বয়েস হবে, একটু কালোর ওপর সুঠাম সুন্দর চেহারা। সুমিত্রা নত হয়ে প্রণাম করতে কাছে টেনে নিলেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন একটু। তারপর খবর নিলেন, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মহিলার নিরীক্ষণ করে দেখাটা কেন যেন তাৎপর্যশূন্য মনে হল না সুমিত্রার। মাথা নাড়লেন, অসুবিধে হচ্ছে না। অপর্ণা দেবী তাঁকে প্রত্যেকটা কুটির দেখালেন, ছনের বড় ঘর তুটো দেখালেন, মেয়েদের হাতের কাজ দেখালেন। গাঁয়ের তুস্থ মেয়েরা এসে একটু আধটু পড়াশুনা করে, গান বাজনা শেখে। বছর কুড়ি বাইশ পঁচিশের বারো তেরোটি মোটামুটি সুশ্রী মেয়েকে দেখলেন যারা এখানেই থাকে। এদের দেখামাত্র বান্ধবীর সেই মন্তব্য মনে পড়ে গেল, এদের জন্যেই মঙ্গল ঘোষের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন মহিলা। একটুও বিশ্বাস হল না সুমিত্রার, নিতান্তই রটনা ভাবলেন।

আসার আগে সুমিত্রা বললেন, আমার জন্যে মঙ্গলবাবুর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না…আমি অনায়াসে আপনার এখানে থেকে কাজ সেরে যেতে পারতাম।

ঠাণ্ডা মুখে অপর্ণা দেবী জবাব দিলেন, ছেলেকে বলেছিলাম সে-কথা···ও নিজেও এখানে থাকতে পারত। কথা শোনে কে···আমি ছেলে ভাবলেও সে মা ভাবে না।

সুমিত্রা চকিতে একবার তাকালেন তাঁর দিকে। আর কথা বাড়ালেন না।

তিনটে দিন কেটে গেল। কাজ ভালোই হয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরির বইগুলো দেখার আর সময় হল না। গোটা কয়েক পুঁথিও বাকি থেকে গেল, কাজে লাগুক বা না লাগুক একটু চোখ বোলাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এ-যাত্রায় আর থাকা সম্ভব নয়। আর একবার দিন কয়েকের জন্য এসে পর্ণালয়ে থেকে কাজ সারার কথা ভেবে রেখেছেন।

সকাল দশটায় বাঁকড়োর বাস। মনে মনে খুব আশা করছিলেন তার আগে এ বাড়ির মালিকটি এসে যাবেন।

এলেন না।

দেখা দিন দশেকের মধ্যেই হল। কলকাতায়, একেবারে সুমিত্রাদের বাড়িতে। বিকেলে কাজ সেরে বাড়িতে পা দিয়েই দেখেন বাইরের ঘরে মঙ্গল ঘোষ বসে বাবা আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় একটা যেন সাড়াই জাগল সুমিত্রার। এই লোকের কথা এ ক'দিনে অনেকবারই মনে হয়েছে। বাবা-ভাইয়ের কাছে ভালুকের হাত থেকে বাঁচার গল্প করেছেন, কিন্তু গাড়ি বিগড়নোর ফলে জঙ্গলে রাত কাটানোর কথা বলেন নি।

—আপনি!

বিস্ময়ের জবাবে মঙ্গল ঘোষ হাসছেন মুখের দিকে চেয়ে। তারপর বললেন, আপনি তো এখানে আমাকে বেশ বীরপুরুষ বানিয়ে রেখেছেন দেখছি।

চাপা আনন্দে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাদের বাড়ির ঠিকানা পেলেন কি করে?

এ-কথার জবাবেও ভদ্রলোক হাসতেই লাগলেন। সুমিত্রা কেন যেন আরো বেশি লজ্জা পেলেন। অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ভাইকে ডেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হল, ভাইটাও যেন তাঁর চাপা আনন্দ টের পেয়েছে।

জলযোগের পর তাঁকে নিরিবিলিতে পেয়েই অনুযোগের সুরে বললেন, আমি কি একরাশ খাবার জন্যে এখানে এলাম?

হাসি মুখে সুমিত্রা ঘুরিয়ে জবাব দিলেন, ভারী তো খাওয়া··· আপনার ওখানে যে যত্ন পেয়েছি, সে-রকম করার আমাদের সাধ্যিও নেই।

—বুঝলাম। হাসিমাখা স্বচ্ছ দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর। —আপনার কাজ শেষ করে আসতে পেরেছেন?

—না···আর একবার চার পাঁচদিনের জন্য যাওয়া দরকার। কিন্তু আমার যাওয়া মানেই তো আপনাকে বাড়িছাড়া করা।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, আমি একটা বাউণ্ডুলে লোক, আমার জন্যে কিছু ভাববেন না···আবার কবে আসছেন বলুন।

সব শোনার পর আর একবার একটু বেশি সময় নিয়ে কাজ সেরে আসার কথা তাঁর গবেষণার অধ্যাপকটিও বলেছেন। সুমিত্রা একটু ভেবে বললেন, যাব তো···আচ্ছা আমি তো অনায়াসে পর্ণালয়েও থাকতে পারি ক'টা দিন?

মঙ্গল ঘোষ মাথা নাড়লেন। —তাতে আমার বিশেষ আপত্তি। আমাকে বাড়িছাড়া করতে যদি না চান তাহলে না হয় পর্ণালয় থেকে একজন ছেড়ে তিন জন মহিলাকে এনে আপনার পাহারায় বসিয়ে দেব। কিন্তু থাকতে হবে আমার বাড়িতেই।

পাহারার কথা শুনে সুমিত্রার সমস্ত মুখ লাল। তাড়াতাড়ি

প্রসঙ্গান্তরে আসার চেষ্টা। বললেন, অপর্ণা দেবীর সঙ্গে একদিন আলাপ করে এসেছিলাম। খুব ভালো লাগল। আপনাকে তিনি খুব ভালবাসেন মনে হল···।

মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন মঙ্গল ঘোষ। একটিও মন্তব্য না করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শুশুনিয়ায় কবে আসছেন?

—দেখি···। আপনি কলকাতায় কবে এলেন?

—আজই।

—কোথায় উঠেছেন?

একটা বড় হোটেলের নাম করলেন। বললেন, কলকাতায় এলে ওখানেই উঠি।

—দিনকতক থাকবেন?

—না, কাজ শেষ হয়ে গেল যখন রাতের গাড়িতেই ফিরব ভাবছি।

কাজ শেষ হওয়ার প্রসঙ্গে ভদ্রলোকের ঠোঁটের ফাঁকের হাসিটুকু কি-রকম যেন অর্থপূর্ণ মনে হল। চাউনিটাও তেমনি হাসিমাখা। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতায় বিশেষ কোনো কাজ ছিল বুঝি?

মুখে আবার সেই হাসি। সেই চাউনি।

মঙ্গল ঘোষ চলে যাবার পরেও থেকে থেকে মুখ রাঙা হয়েছে সুমিত্রার। কলকাতার কাজটা কি সেটা যেন ওই হাসি আর চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষটা। জেরা করলে হয়তো বলে বসতেন, আপনাকে দেখতে আসাটাই কাজ।

না, এই সাতাশ বছর বয়েস পর্যন্ত পুরুষ সম্পর্কে বিশেষ ভাবার অবকাশ তাঁর হয়নি। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিলাভই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এমনই যোগাযোগ এই একজনের সঙ্গে যে ঘুরেফিরে তাঁর কথা মনে আসছেই।

তিন সপ্তাহ বাদে আবার দেখা। বীরশালে মঙ্গল ঘোষের বাড়িতেই। একটা সহজ উপায় মাথায় আসতেই সুমিত্রা ছোট ভাইকে সঙ্গে করে চলে এসেছেন। হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়ে সনৎ বা সন্তু বাড়িতেই বসে আছে। তাকে বেড়ানোর প্রস্তাব দিতে সে সানন্দে রাজি।

সন্তুকে দেখে মঙ্গল ঘোষকেও বেজায় খুশি মনে হল। এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দোতলায় নিয়ে তুললেন। দোতলার বারান্দার দু'মাথায় আর দেয়ালে শিকারের এত নমুনা দেখে সন্তু বারান্দার অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেই ফাঁকে মঙ্গল ঘোষ বললেন, খুব খুশি হলাম।...এবারে বডি-গার্ড সঙ্গে করে এনেছেন, আমাকে তাহলে বাড়িছাড়া হতে হবে না?

সুমিত্রার সমস্ত মুখে লালের আভা ছড়াল একটু। চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়লেন। হবে না।

পিছন ফিরে অদূরের সন্তুর দিকে তাকিয়ে মঙ্গল ঘোষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হঠাৎ। বললেন, আমার ঘরের আপত্তিকর জিনিসগুলো ও দেখার আগে চটপট সরিয়ে রেখে আসি।

লঘু পায়ে ওদিকে চললেন।...ওই লোকের চোখে মুখে খুশি উপচে উঠতে দেখছেন সুমিত্রা। তাড়াতাড়ি কোন জিনিস সরাতে চললেন তাও এক-রকম বলেই গেলেন। সেদিকে চেয়ে মুখে হাসির আভাস লেগে আছে তবু। তাঁর কেমন মনে হল, ওই মানুষ অবাধ্য হতে চাইলে কাউকে আনা না আনা সমান। তবু আগের মতো অস্বস্তি বোধ করছেন না সুমিত্রা।

তিনটে দিন খুব ভালোই কাটল। মঙ্গল ঘোষ প্রথম দিনেই পর্ণালয় থেকে সুশীলাকেও আনিয়েছেন আবার। বলেছেন, আমি তো সন্তুবাবুকে নিয়ে থাকব, আপনার কাছেও একজন থাক।

দিনের বেশিরভাগ সময় আর সন্ধ্যার পরেও খানিকক্ষণ সুমিত্রা লাইব্রেরিতে কাটান। হাল্কা মনে কাজ করতে পারছেন তাই কাজ

এগোচ্ছেও ভালো। অবকাশ সময়ে তিনজনে একত্র হন। মঙ্গল ঘোষের ফুর্তির দিকটা এবারেই দেখলেন সুমিত্রা। সন্তু এরই মধ্যে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছে। মঙ্গল ঘোষ তাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘোরেন, পাহাড়ে বেড়ান। শিকারের গল্প শোনান। দ্বিতীয় দিনই লাইব্রেরিতে এসে সন্তু দিদিকে বলেছে, মঙ্গলদা একটা মানুষের মতো মানুষ দিদি, কলকাতায় ওঁকে ঠিক বুঝতেই পারিনি—

ভালো মুখ করে দিদি বলেছেন, মানুষ মানুষের মতো হবে না তো কার মতো হবে?

কিন্তু চারদিনের দিন বিকেলে ভিতরটা হঠাৎ যেন বিষাক্ত হয়ে গেল সুমিত্রার। মঙ্গল ঘোষ আর সন্তু তখন বাড়ি নেই। সুশীলা তাঁকে জানালো, মা একবার আপনাকে ডেকেছিলেন···।

সুমিত্রা তক্ষুনি চলে গেলেন। বিকেলে না গেলে রাতের কাজ পণ্ড। আগের বারের মতোই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন সুমিত্রা। কিন্তু অপর্ণা দেবীকে কি-রকম যেন গম্ভীর মনে হল একটু। বললেন, আজ চারদিন এসেছ, না ডাকতে মায়ের সঙ্গে একবার দেখাও করলে না।

সুমিত্রা সত্যিই লজ্জা পেলেন একটু। বললেন, এসেই কাজে লেগে গেছি···ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি।

অপর্ণা দেবী তাঁকে নিজের ঘরে এনে বসালেন। নিজেও সামনে বসলেন।—তোমার লাইব্রেরির কাজ এখনো অনেক বাকি?

প্রশ্নটা খট্ করে কেমন কানে বিঁধল সুমিত্রার। তবু সত্যি জবাবই দিলেন।—আরো চার পাঁচ দিন লাগবে মনে হয়।

অপর্ণা দেবীর মুখে অদৃশ্য কয়েকটা কঠিন আঁচড় পড়তে দেখলেন যেন। কিন্তু গলার স্বর নরম।—মায়ের কাছে একটা সত্যি কথা বলো, তুমি আর মঙ্গল কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু স্থির করে ফেলেছ?

—না না···এ আপনি কি বলছেন! হঠাৎ একটা ধাক্কাই খেয়েছেন যেন সুমিত্রা।—আমি অতি সামান্য সাধারণ ঘরের মেয়ে, নিজের

পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি, এছাড়া আর কোনো চিন্তাই আমি কখনো করিনি।

অপর্ণা দেবী অপলক চেয়ে রইলেন একটু।—তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, সুশীলাও তোমার অনেক প্রশংসা করেছে। ...আমার বিবেচনায় আর যে ক'টা দিনের কাজ বাকি, আমার এখানে থেকে করো, তোমার ভাই এসেছে শুনলাম সে ওখানে থাকতে পারে। আর তাতে যদি অসুবিধে হয়, যত বই আর যে ক'টা পুঁথি তোমার দরকার তুমি কলকাতায় নিয়ে যেতে পারো, ওই লাইব্রেরির দায়িত্ব আগেও আমার ছিল, এখনো আমারই।...প্রায় গ্রাম এটা, এরই মধ্যে লোকে পাঁচ রকম ভাবছে সেটা আমার ভালো লাগছে না।...তাছাড়া তাকে আমি নিজের ছেলে ভাবলেও তোমার ভালো চিন্তা করেই একথা বলছি...এত লেখা-পড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি, আশা করছি এর বেশি আর কিছু বলার দরকার হবে না।

দু'কান দিয়ে যেন গরম আগুন ছুটেছে সুমিত্রার। অপমানে আর গ্লানিতে স্তব্ধ খানিকক্ষণ। মহিলা বলতে চান তাঁকে বিশ্বাস করলেও নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করেন না। আর গাঁয়ের মতো এই জায়গার লোকে পাঁচ রকম ভাবছে এ তো স্পষ্ট করেই বললেন।

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছেন। ভাই বা বাড়ির মালিক তখনো বাইরে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। সুমিত্রা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতেই পারলেন না।

মঙ্গল ঘোষ ঘরে ঢুকলেন। এ-সময় লাইব্রেরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত একটু। মুখের দিকে চেয়ে হয়তো আরো অবাক। তাঁর পিছনে সন্ত।

মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, আজ কাজে বসলেন না?

সুমিত্রা মাথা নাড়লেন। অস্ফুট জবাব দিলেন, কাজ এক রকম হয়ে গেছে।

মঙ্গল ঘোষ নীরব বিস্ময়ে চেয়েই রইলেন শুধু। সন্তু ফস করে বলে উঠল, সে-কি ছোড়দি, এই সকালেই না বললি আরো চার পাঁচ দিন লাগতে পারে

প্রায় চাপা ধমকের সুরে সুমিত্রা বললেন, এখন তো বলছি লাগবে না, কাল সকালেই আমরা যাব।

সন্তু চুপ। মঙ্গল ঘোষ নীরবে নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর বললেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে দেব।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাতের আহার আজ প্রায় নীরবে সমাধা হল। হঠাৎ ব্যাপারখানা কি হল শুধু সন্তুই যেন ভেবে পাচ্ছে না।

খাওয়ার পর সন্তু আজ তার ঘরে ঢুকে গেল। সুমিত্রা নিজের ঘরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে মৃদু গম্ভীর গলায় বাইরে থেকে মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, আসতে পারি?

সুশীলা তখনো ঘরে আসে নি কেন সুমিত্রা এই থেকেই বুঝে নিলেন। ঠাণ্ডা গলায় সাড়া দিলেন, আসুন—

ভিতরে পা দিয়ে মঙ্গল ঘোষ গভীর দু'চোখ তুলে দেখে নিলেন একটু। সুমিত্রার অস্বস্তি, ভিতর দেখার মতোই এই দৃষ্টি। খুব নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখ মঙ্গল ঘোষের।—পর্ণালয়ের অপর্ণা দেবীর সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে শুনেছি···আমার সম্পর্কে কিছু কথাও হয়েছে ধরে নিতে পারি?

সুমিত্রা হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তিনি তো আপনাকে নিজের ছেলে ভাবেন, আপনি তাঁকে অর্পণা দেবী বলেন কেন?

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির রেখা দেখা গেল কি গেল না। তেমনি ভারী গলায় জবাব দিলেন, সত্যিই তাঁর ছেলে নই বলে।··· কলকাতায় আপনি বলেছিলেন, ওই মহিলা আমাকে খুব ভালোবাসেন। সেদিন জবাব দিই নি, সত্যিই ভালোবাসেন···বেড়াল যেমন ইঁদুর ভালোবাসে তাঁর আমাকে ভালোবাসাটা অনেকটা সেই রকম। আপনি

কাল যানই যদি বাধা দেব না···কিন্তু তিনি কি বলেছেন জানতে পারি ?

ভালোবাসার উপমা শুনে একটু ধাক্কা খেয়েছেন সুমিত্রা। এবারে অপমানের প্রসঙ্গ আর এই লোকের চরিত্র প্রসঙ্গে ইঙ্গিতও মনে পড়তে ভিতরটা তিক্ত। জবাব দিলেন, এ-সব আলোচনা আমার ভালো লাগছে না।

—বেশ, বলবেন না তাহলে। কিন্তু আমার স্পষ্ট কিছু বক্তব্য আছে সেটুকু শুনুন।···আমার স্বভাব-চরিত্র একেবারে ত্রুটিশূন্য এ-কথা আমি বলছি না, কিন্তু যতটুকু শুনে আপনি কালই কলকাতায় চলে যেতে চাইছেন তার অনেকটাই মিথ্যে। আমি মিথ্যে বলব না কারণ আমি কাউকে বা কোনো কিছুকে ভয় করি না। অপর্ণা দেবী বুদ্ধিমতী, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে সেটুকু তিনি বুঝেছেন। তাই তাঁর ভয় আমাকে নয়, আপনাকে।

তাঁকে ভালো লেগেছে এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ফলে সুমিত্রার অস্বস্তি। কিন্তু লোকটির বলার ধরন এমন শান্ত গম্ভীর যে ভয় কেন তাও শোনার ইচ্ছে।

ঘরের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে মঙ্গল ঘোষ সোজা মুখোমুখি দাঁড়ালেন আবার।—আমার জীবনে সব থেকে শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন আমার বাবা। মা নেই, তাই তিনি আমার বন্ধু ছিলেন, গুরু ছিলেন। আমি তখন কলেজে সবে ঢুকেছি। সেই সময় অপর্ণা দেবী এলেন আমার উদার বাবার আশ্রিতার মতো। লেখাপড়া জানতেন তাই বাবা তাঁকে লাইব্রেরির কাজ দিলেন। কিন্তু দু'টা বছর না যেতে আমার অত শ্রদ্ধার বাবাকে আমি ঘৃণা করছি, আর মায়ের মতো অপর্ণা দেবীকে আরো বেশি ঘৃণা করেছি। সেটা তাঁরা বুঝেছেন। বাবা আমার সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি কখনো। তখন থেকে শিকারের নেশায় আমি বনে জঙ্গলে ঘুরি, নির্মম হাতে জানোয়ার শিকার করি।

'...অপর্ণা দেবীকে বাবা ওই আশ্রম করে দিলেন। ওই জায়গা জমি সব বাবার—সে-সব তাঁর নামে লেখাপড়া করে দিলেন। অনেক টাকাও দিলেন তাও জানি।

'...শেষ সময়ে বাবার আর্ত চাউনি আমার মনে আছে। তবু তাঁকে ক্ষমা করতে পারিনি আমি। তবে বাবার ইচ্ছে বুঝে এখনো ওই পর্ণালয়ে আমি টাকা দিয়ে থাকি। কিন্তু অপর্ণা দেবী শুধু ওটুকুতে সন্তুষ্ট থাকার মানুষ নন। ওই পর্ণালয়ের জন্য তাঁর আরো অনেক টাকা দরকার অনেক জায়গা দরকার। এতবড় এই বাড়ি ঘর আমি দখল করে থাকি সেও তাঁর ইচ্ছে নয়।...আমার এই ভবঘুরে শিকারী জীবন কত নিঃসঙ্গ তিনি জানেন। তিনি চান এইভাবেই আমা র জীবনটা কেটে যাক। আমার স্খলন দেখলে তিনি সব থেকে বেশি খুশি হন। আমি একটা কথাও মিথ্যে বলছি না, মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়। এর পরেও আপনার বিচারে কাল যদি যাওয়া স্থির হয়, আমি বাধা দেব না।

পরদা ঠেলে ঘর থেকে চলে গেলেন। সুমিত্রা চিত্রার্পিতের মতো বসে। বুকের তলায় থেকে থেকে যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

না, পরদিন তিনি গেলেন না। তার পরদিনও না। কিন্তু এ নিয়ে সন্ত পর্যন্ত তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। তাঁকে নিয়ে মঙ্গল ঘোষ আগের মতোই হাসিখুশি।

তবে একদিন আগে চলে এলেন ঠিকই। মঙ্গল ঘোষকে বললেন, কাজ মোটামুটি শেষ, আজই চলি।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, বেশ।

—আপনি কলকাতা আসছেন নাকি শিগগীর?

মুখের দিকে চেয়ে মঙ্গল ঘোষ হাসছেন একটু একটু। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অস্বস্তি সুমিত্রার। মঙ্গল ঘোষ বললেন, খুব শিগগীরই আসছি।

ঠিক দশ দিনের মাথায় মিউজিয়ামে কাজের মধ্যে বসেই একটা টেলিফোন পেলেন সুমিত্রা। চেনা ভারী গলা। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি সুমিত্রার। আবার ভালোও লাগছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কবে এলেন ?

—আজই দুপুরে। সেই অভিজাত হোটেলের নাম করে মঙ্গল ঘোষ বললেন, অত নম্বর সুইটে আছি। আপনার ছুটি কখন ?

—ছ'টারও পরে। একটা দরকারী কাজে বসেছি।

—ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করব—সাড়ে ছ'টা সাতটার মধ্যে তাহলে দেখা হবে।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলল, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন না !

—না। আজ আপনি আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের রিসিভার নামানোর শব্দ। একটা অজানা অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলেন সুমিত্রা। আমন্ত্রণটা জুলুমের মতো লাগল। একবার ভাবলেন যাবেন না, ছ'টার সময় আবার টেলিফোন করে দেবেন।

কিন্তু ছ'টার পর কে যেন তাঁকে টেনে বার করল কাজের জায়গা থেকে। যেতে হচ্ছে বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে কেমন।

দোতলার নিজের সুইটের দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মঙ্গল ঘোষ। তাঁকে দেখে কোনো কথা বললেন না। সমস্ত মুখ নীরব হাসিতে ভরাট হয়ে গেল। এ-রকম অভ্যর্থনার ফলে সুমিত্রার মুখও রাঙিয়ে উঠছে।

গালচে বিছানো বিলিতি ফ্যাশনের সুইট। এ-রকম জায়গায়

সুমিত্রা জীবনে আসেন নি। দামী সোফা সেটি, একদিকে শয্যা;
এয়ার কনডিশনড ঘর, অ্যাটাচড বাথ।

মুখোমুখি বসলেন দুজনে। মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন,
খাবার কি আনতে বলব?

সুমিত্রা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, কিছু না, আমার তাহলে দেরি
হয়ে যাবে।

নির্দ্বিধায় মঙ্গল ঘোষ বললেন, দেরি এমনিতেও হবে। হাত
বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।—রুম সার্ভিস প্লীজ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।—দশ
দশটা দিন বীরশালের ঘরে বসে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ধৈর্য পরীক্ষা
করলাম, তারপর আজ চলে এলাম···

সুমিত্রা কেন যে এত বিব্রত বোধ করছেন জানেন না। মুখ
তুলে তাকালেন শুধু একবার।

একজন বেয়ারা এলো। মঙ্গল ঘোষ তাকে যে খাবারের অর্ডার
দিলেন শুনে সুমিত্রাই যেন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলেন। বেয়ারা
চলে যেতে বললেন, এত কি হবে, তাছাড়া অনেক দেরি হয়ে যাবে,
বাবা ভাববেন···আপনাকে আসার জন্য একটা টেলিফোন করে দিয়ে
আমি বাড়ি চলে যাব ভাবছিলাম।

তাঁর হাসি মাখা চাউনিটাই যেন বেশি অস্বস্তির কারণ সুমিত্রার;
ওই হাসিতে কি যে আছে বুঝছেন না।

মঙ্গল ঘোষ বললেন, দেরির জন্য ভাবনা নেই, আমি বাড়ি
পৌঁছে দেব

সেটা যেন আরো সংকোচের ব্যাপার হবে। সুমিত্রা মাথা
নাড়লেন, তার দরকার নেই···।

মঙ্গল ঘোষ চেয়েই আছেন। হাসছেন অল্প অল্প।—ভালো
করে আসার আগেই যাওয়ার কথা আমার ভালো লাগছে না।···
সন্তু মাস্টার ভালো আছে?

—হ্যাঁ, আপনার কথা বলে খুব।

—বলবেই তো, আমি সকলের কাছেই মন্দ লোক নাকি!…বাবা কেমন আছেন?

—ভালো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার আনার হুকুম হয়েছিল। ট্রে ভরতি খাবার নিয়ে বেয়ারা তাড়াতাড়িই এলো।

মঙ্গল ঘোষ জোর করেই এটা ওটা তাঁর ডিশে তুলে দিতে লাগলেন। নিজেও খেলেন। খেতে খেতেই রিসার্চ শেষ হতে আর বাকি কত সেই খোঁজ খবর নিলেন।

অ্যাটাচড বাথ থেকে মুখ হাত ধুয়ে সুমিত্রা বললেন, আমি কিন্তু আর বসছি না।

জবাবে মঙ্গল ঘোষ তেমান হাসি মুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে, যে হাসি দেখলে সুমিত্রার অগোচরের অস্বস্তি। মঙ্গল ঘোষ বললেন, আমার দোষের কথা অনেক শোনা আছে, কিন্তু একটা গুণের কথা প্রায় কেউ জানে না…কাউকে দেখলে আমি তার অনেকখানি ভেতর দেখতে পাই। তাই আমার দিকের ফয়েসলা হয়েই গেছে। হাসছেন। …এখন আমি ভাবছিলাম আমার মতো কোনোরকমে বি-এ পাস একটা লোকের ঘরে সুমিত্রা দেবীর মতো কোনো ফার্স্ট ক্লাস এম-এ আর রিসার্চ স্কলার পাকাপাকিভাবে আসতে পারেন কি না?

শোনামাত্র বুকের তলায় একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে যেন সুমিত্রার। নিরুত্তর।

—পারে?

কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে সুমিত্রার। অস্ফুট জবাব দিলেন, ভেবে দেখিনি কখনো…

মুখে সেই রকমই হাসি মঙ্গল ঘোষের, হাসি মাখা চাউনিটা অপলক। বললেন, আমার ধৈর্যের দৌড় মাত্র দশ দিন।…ভাবতে কতদিন লাগবে?

সুমিত্রা মুখ তুললেন। ওই মুখের দিকে তাকানো দায়, জবাব দেবেন কি। কিন্তু তারপরেই যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তার জন্য কোনো মেয়েই বোধহয় প্রস্তুত থাকতে পারে না। মঙ্গল ঘোষ কাছে এগিয়ে এলেন। খুব কাছে। পুষ্ট দুটো হাত তাঁর দুই কাঁধের ওপর উঠে এলো। সেই স্পর্শে সুমিত্রার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল একবার। তারপরেই কোন বিস্মৃতির মধ্যে যেন তলিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। হাসিমাখা ওই ঠোঁট দুটো তার দুই অধরের ভেতর দিয়ে যেন প্রাণসত্তাটুকুও টেনে নিতে লাগল। কতগুলো নিঃসীম মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর ছাড়া পেলেন। আবার তার দুই কাঁধের ওপর ওই লোকের হাত। হাসিমাখা চাউনি আরো গভীর। বললেন, এর পরেও ভাবতে আর কত সময় লাগতে পারে

বিয়ে হয়ে গেল।

হ্যাঁ, অনেকগুলো দিন আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে ডুবে গেছলেন মঙ্গল ঘোষ। অতটা বরদাস্ত করতে চান না সুমিত্রা, তাঁর অনেক কাণ্ড-কারখানা স্থূল নগ্ন মনে হয়। বলেন, তুমি একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া একটা, সাবধান, এখন অনেক কাজ আমার—কোনোরকম গণ্ডগোল হলে মুশকিলে পড়ে যাব।

তাঁর মুশকিল অর্থাৎ সন্তান সম্ভাবনা। কিন্তু সে আশংকা পরিহার করেও ভোগের রীতি জানেন মঙ্গল ঘোষ। সুমিত্রা সন্দিগ্ধ মুখে বলেন, তুমি এমন সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠলে কি করে, আগের অভিজ্ঞতার ফল নাকি?

মঙ্গল ঘোষ হাসেন, বলেন, অভিজ্ঞতা সামান্যই, তবে আমি স্বভাব-গুণী। আর ইচ্ছে শক্তি দেখলে না, তুমি বলা মাত্র এতকালের বোতল গেলাসের অভ্যাস একেবারে বিসর্জন দিলাম—মনের এই জোরের পুরস্কার আমার প্রাপ্য।

বিয়ের পর বীরশালের বাড়িতে এসে প্রথমেই শোয়ার ঘরের

আলমারি থেকে বোতল গেলাস দূর করেছেন সুমিত্রা। আর মঙ্গল ঘোষও তাঁর এক কথায় মদ ছেড়েছেন। নিজেই হেসে বলেছেন, কিছু ছিল না বলে এইটে ছিল, এখন আর দরকার কি।

সুমিত্রার রিসার্চের বিষয়েও মঙ্গল ঘোষের চপল আগ্রহ। বলেন, রসচর্চার জন্যে তোমার কলকাতায় থাকার দরকার কি, এখানে বসেই তো হতে পারে।

সুমিত্রা হাসি মুখে মাথা নাড়েন। হতে পারে না।

—কেন পারে না, কি রকম রস নিয়ে কারবার তোমার?

—আট রকমের।

—তাই নাকি! জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহা মঙ্গল ঘোষের।—কি কি আট রকমের শুনি?

সুমিত্রা গড়গড় করে বলে যান, হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত আর—

—সাতটা হল, আর কি?

—শৃঙ্গার। হেসে ফেলেন।

—বেশ। গবেষণারত মুখ যেন মঙ্গল ঘোষেরও।—প্রথমে হাস্যরস—উদাহরণ দাও।

—অকুঞ্চ্য পানিমশুংচি মম?...

বাধা দিয়ে মঙ্গল ঘোষ বললেন, ওরে বাবা, থাক-থাক, বাংলায় বলো।

সুমিত্রা মাথা নাড়েন, বাংলায় বলবেন না। কিন্তু পীড়াপীড়ির ফলে বলতেই হয়। ছদ্ম গম্ভীর মুখ। বলে গেলেন, পতিতা আমার মাথায় অশুচি জল ঢেলে দিয়ে আর গায়ে থুথু ছিটিয়ে প্রহার দান করতে লাগল। আমার এই মাথার প্রতি স্থান মন্ত্রপূত জলে পবিত্র হয়ে ছিল—'হায় হায় আমি মরলাম'—এই বলে বিষ্ণুশর্মা রোদন করছেন।

মঙ্গল ঘোষের দু'চোখ বড় বড়। —তার মানে বিষ্ণুশর্মা পতিতালয়ে গেছলেন?

—আমি জানি না। যাও!

—ঠিক আছে, মঙ্গল ঘোষ হিসেব করছেন, তারপর করুণ রস আমার পছন্দ নয়, রৌদ্রও না, তারপর বীর—বীর রস কি?

সুমিত্রা হাসি মুখেই বলে গেলেন, হে ক্ষুদ্র অশ্বগণ, আমার এই বাণ ইন্দ্রের হাতির মাথা বিদীর্ণ করেছে তাই এ বাণ লজ্জায় তোমাদের শরীর বিঁধবে না, তোমাদের ভয় নেই। হে লক্ষ্মণ তুমিও স্থির থাকো। আমার ক্রোধের পাত্র তুমিও নও—যিনি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গিমার লীলায় জলধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন সেই রামচন্দ্রকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

—হাইক্লাস! আনন্দের ফাঁকে আরো গা ঘেঁসে বসে মঙ্গল ঘোষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, কে বলেছিল? রাবণ না ইন্দ্রজিৎ?

সুমিত্রা ভ্রূকুটি করলেন, সরে বোসো—

কানেই গেল না যেন মঙ্গল ঘোষের।—তারপর ভয়ানক রস থাক, বীভৎস আর অদ্ভুত রসও থাক—বাকি থাকল শৃঙ্গার রস—সেটা কি?

—আমি জানি না।

—জানতেই হবে, না হলে গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

হাসছেন সুমিত্রাও।—এটা সংস্কৃততে বলতে পারি।

—আচ্ছা, তাই বলো—শুনি।

সংস্কৃত বলাটাও যেন কান পেতে শোনার মতো মিষ্টি মনে হল মঙ্গল ঘোষের। ঠোঁটের কোণে হাসি আটকে সুমিত্রা বলে গেলেন—

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
র্নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম।
বিশ্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েন হসতা বালা চিরং চুম্বিত।

সুমিত্রার নিজেরই মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মঙ্গল ঘোষ গম্ভীর। তাঁর হাত চেপে ধরে ঘোষণা করলেন, বাংলায় না বললে এটা অর্ধশৃঙ্গার রস হল—না বোঝালে বাকিটা আমি সম্পূর্ণ করব।

নিরুপায় হয়ে সুমিত্রা বললেন, আচ্ছা হাত ছাড়ো বলছি।

হাত ছাড়লেন।

—সরে বোসো।

সরে বসলেন।

অগত্যা সুমিত্রাকে বলতে হল।—বালিকা চারদিকে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই, বাসগৃহ শূন্য। তখন শয্যা থেকে আস্তে আস্তে খানিকটা উঠে কপটনিদ্রাশ্রয়ী স্বামীর মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারপর নির্ভয়ে চুমু খেল। তার গণ্ডস্থল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তাই দেখে প্রিয় সেই লজ্জানম্রমুখীকে দীর্ঘ চুমু—যাঃ!

চকিতে খাট থেকে নেমে নাগালের বাইরে তিনি। বড় নিঃশ্বাস ফেলে মঙ্গল ঘোষ বললেন, প্র্যাকটিকাল ডিমনস্ট্রেশন ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু এতবড় আনন্দের উৎসটায় বড় দ্রুত টান ধরে গেল যেন। তার কারণ সুমিত্রার কাজের তাড়না আর মঙ্গল ঘোষের তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। ডক্টরেট পাওয়ার পর সুমিত্রার কোনো কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ঢোকাব ইচ্ছে। কিন্তু এই লোকের জন্য থিসিস সম্পূর্ণ করার কাজই হয়ে উঠছে না। স্কলারশিপ গেলেও এখন অবশ্য টাকার ভাবনা নেই। কিন্তু ছ'টা মাস এমনিতেই দেরি হয়ে গেল।

মঙ্গল ঘোষ বলেন, তুমি ও-সব নিয়ে পড়ে থাকলে আমার চলবে না—সাফ কথা।

সুমিত্রা জবাব দেন, তুমি কলকাতায় বাড়ি ঠিক করো তাহলে।

—কলকাতায় দুদিন থাকলেই আমার দম বন্ধ হয়ে যায়।

—কাজ বন্ধ হলে আমারও দম বন্ধ হয়ে যায়।

সত্যি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন মঙ্গল ঘোষ, আমার থেকে তোমার কাজ বেশি হল?

সুমিত্রা বলেন, দুটো দু'রকমের, কোনোটাই কম নয়।

—ও-সব আমি শুনতে চাই না, তুমি আমার চরিত্র খারাপ করে দিয়েছ।

সুমিত্রা হাসি মুখেই টিপ্পনী কাটেন, নমুনা যা দেখছি, খারাপ হতে খুব একটা বাকি ছিল না।

কিন্তু পরের তিন-চার মাসের মধ্যেও একটানা সাতদিন কলকাতায় স্থির হয়ে বসতে পারেন না সুমিত্রা। চিঠিতে তলব আসতে থাকে নয়তো মঙ্গল ঘোষ নিজেই এসে হাজির হন। এলে সেই নামী হোটেলে ওঠেন। আর সুমিত্রাকেও তখন এসে থাকতে হয় সেখানে। পরের চার মাসেও কাজ তেমন এগলো না দেখে প্রোফেসার অনুযোগ করেন। সুমিত্রার তখন এই লোকের ওপর রাগ হয়। আর মঙ্গল ঘোষের তার ফলে অভিমান। গোটা একটা মাস খবর-বার্তা না দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন তিনি, সুমিত্রার তখন বাধ্য হয়েই শুশুনিয়ায় ছুটতে হয়।

এক একসময় যথার্থ তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেন সুমিত্রা। এমনও সন্দেহ হয় নিজে সামান্য বি-এ পাস বলেই তাঁর ডক্টরেট পাওয়া বা কলেজ ইউনিভার্সিটির কাজে ঢোকার ব্যাপারে তাঁকে আগলে রেখে বাধা দেওয়ার চেষ্টা।

তবু একভাবে কেটে যাচ্ছিল, বিপর্যয় এলো অপ্রত্যাশিত আর একদিক থেকে।

মঙ্গল ঘোষ তখন কলকাতার সেই নামী হোটেলে। এক বিকেলে সুদর্শন এক ভদ্রলোককে সেই সুইটে এনে সুমিত্রা আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রোফেসার কৃষ্ণকুমার আচারিয়া, ইউ-পির লোক, সুমিত্রার গবেষণার একই বিষয়ে ডক্টরেট—ফলে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য মিলছে, ইত্যাদি।

মঙ্গল ঘোষেরই বয়েসি হবেন কৃষ্ণকুমার, সভ্য ভব্য কাঁচা হাসি মাখা মিষ্টি মুখ। মঙ্গল ঘোষও অন্তরঙ্গ মুখে আদর আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক চলে যেতেই হঠাৎ একেবারে ভিন্ন মুখ

তাঁর। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কত দিনের পরিচয় তোমার ?

রকমসকম দেখে সুমিত্রা অবাক একটু।—মাস দেড়েক। সত্যিই মস্ত স্কলার···আমাদের রিসার্চ মিউজিয়ামেই জয়েন করেছেন।

—তোমাকে সাহায্য করেছেন খুব ?

—খুব।

—সাহায্য যখন করেন তখন তুমি তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখো ?

—তার মানে ?

হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মঙ্গল ঘোষ।—তার মানে এই লোকের সংস্রব তোমাকে ছাড়তে হবে। স্পষ্ট কথা বুঝতে পারছ ?

সুমিত্রা বিমূঢ় খানিক। এ-রকম মুখ কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।—বুঝতে পারছি না। কেন ছাড়তে হবে ?

তেমনি চড়া সুরে মঙ্গল ঘোষ বললেন, ছাড়তে হবে কারণ কাউকে একবার দেখলে আমি তার ভিতর দেখতে পাই। কোন জানোয়ারের চোখে কখন কোন খিদে সেটা আমি বুঝতে পারি।

সুমিত্রা স্তব্ধ খানিকক্ষণ। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠছে। তবু সংযত স্বরে বললেন, খুব নিচু স্তরের কথা-বার্তা কইছ, কাকে কি বলছ জানো না।

—জানি জানি। মঙ্গল ঘোষের আরো উগ্র মেজাজ।—যেটুকু দেখার আমি এরই মধ্যে দেখে নিয়েছি।

সুমিত্রা চেয়ে আছেন।—আমার চোখে তুমি ছোট হয়ে যাচ্ছ কিন্তু।

মঙ্গল ঘোষ বলে উঠলেন, তোমার চোখ নেই। তোমার শরীরের ওপর আমি কারও লোভের চোখ বরদাস্ত করব না। এ তুমি জেনে রেখো।

রাগের সঙ্গে এবারে এক ধরনের ঘৃণাও দেখা দিয়েছে সুমিত্রার চোখে।—তার মানে আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না ?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো কথা নেই, গণ্ডগোল হলে তোমার তাতে কোনো হাত না-ও থাকতে পারে!

লোকটাকে বিকৃত দেখছেন যেন সুমিত্রা।—চার পাঁচ বছর ধরে যে কাজ নিয়ে আছি, তোমার হুকুমে তাহলে সেই রিসার্চ এখন ছাড়তে হবে!

—চুলোয় যাক রিসার্চ, তার থেকে তোমাকে আমি ঢের বেশি বলে ভাবি—বুঝলে? ওই লোকের সংস্রব ছেড়ে যদি রিসার্চ না হয় তাহলে রিসার্চের দরকার নেই।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন সুমিত্রা। অনুচ্চ কঠিন সুরে বললেন, তাহলে আমার কথাও তুমি শুনে রাখো, আমি কিছুই ছাড়ছি না, আমার কাজ আমি শেষ করব, পারো তো তার মধ্যে নিজের একটু চিকিৎসা করিয়ে নাও।

রাগ করে চলে গেলেন। আর তার খানিকক্ষণের মধ্যে মঙ্গল ঘোষও শুশুনিয়া রওনা হলেন।

দুটো মাস নিরুপদ্রবে কাটল এরপর। মঙ্গল ঘোষ চিঠিও লেখেন না। সুমিত্রা কাজে মন ঢেলে দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু থেকে থেকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন। এখনো ভাবতে চান না নিজেকে এমন এক অযোগ্য হাতে সমর্পণ করেছেন। সুমিত্রা তাঁকে স্পষ্ট করে লিখেছেনও সে-কথা। জবাব পাননি।

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হঠাৎ পর্ণালয়ের সুশীলার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন তিনি।

বক্তব্য, বেশ কিছুদিন হল জমিদার বাড়ির মালিক অসুস্থ, বীরশালায় তাঁর একবার আসা উচিত।

তাঁকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখার চক্রান্ত কিনা সুমিত্রা জানেন না। অত শক্তি কেউ ধরে বলে বিশ্বাস করেন না। সেই রাতে রওনা হয়ে পরদিন ভোরে শুশুনিয়া পৌঁছুলেন।

নিচে সরকার বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমতা আমতা করে জানালেন, বাবু অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এখন অনেকটা ভালো।

দোতলায় উঠেই থমকে দাঁড়াতে হল। বারান্দায় বছর বাইশ চব্বিশের বেশ সুশ্রী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে হকচকিয়ে গেল।

সুমিত্রা কাছে এসে ভালো করে দেখলেন আর একবার। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

—মি-মিনা…

—মিনা কে? আরক্ত মুখ সুমিত্রার।

মেয়েটা ঘাবড়েই গেল।—বাবুর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, তাই…

—তাই তুমি সেবা করতে এসেছ?

জবাব পাওয়ার আগেই দেখলেন শোবার ঘরের দরজার কাছে মঙ্গল ঘোষ দাঁড়িয়ে। ডাকলেন, এদিকে এসো, হঠাৎ এসেই ও বেচারীকে নিয়ে পড়লে কেন?

সুমিত্রা এগিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকলেন। চেয়ে দেখলেন। মুখ একটু শুকনো বটে কিন্তু সে-রকম অসুস্থ বলে মনে হল না। তপ্ত কঠিন সুরে বললেন, অসুখ খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলাম…তা সেবা যত্নের ভালো লোকই জুটিয়েছ তাহলে?

চকিতে একটু ভেবে নিলেন মঙ্গল ঘোষ। খবর যদি পেয়ে থাকে তো পর্ণালয় থেকেই পেয়েছে। কারণ সেবার নাম করে ওই সুশ্রী মেয়েটাকে অপর্ণা দেবীই পাঠিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এবার বোঝা গেল। কিন্তু মুখে সেটা ব্যক্ত করলেন না। হাসছেন।

—তা তোমার অত রাগের কি হল, মদ খাব না, এ-ছাড়া আর তো কোনো শর্ত ছিল না তোমার!

একটি একটি করে সুমিত্রা বললেন, এ-রকম ব্যাপার আমার আগেই শোনা ছিল, তখন বিশ্বাস করিনি…বিশ্বাস করা উচিত ছিল।

আবারও হেসে উঠলেন মঙ্গল ঘোষ।—কি ভুলই করেছ। তা তোমার ডক্টর কৃষ্ণকুমারের খবর কি?

তীব্র ব্যঙ্গের সুরে সুমিত্রা বললেন, খুব ভালো···তোমার তুলনায় স্বর্গ।

—বেশ বেশ। হাসছেন তেমনি।—মুখ হাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও তারপর কথা হবে।

তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা সত্যিই হিংস্র লুব্ধ হয়ে উঠেছিল মঙ্গল ঘোষের।

কিন্তু মাথায় আগুন জ্বলল ঘণ্টাখানেক বাদে। তাঁর খোঁজে বাইরে এসে শোনেন তিনি নেই। তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নেমে চলে গেছেন।

মিনাকে তক্ষুনি বাড়ি থেকে তাড়ালেন মঙ্গল ঘোষ। তারপর ফুঁসতে লাগলেন।

কলকাতায় এসে সুমিত্রাকে টেলিফোন করেছেন। সুমিত্রা ও-ধার থেকে সাফ জবাব দিয়েছেন, তাঁর এখন দেখা করার সময় নেই—হাতের কাজ শেষ হলে ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন।

এদিক থেকে ব্যঙ্গ করে উঠেছেন মঙ্গল ঘোষ, কি ঠিক করবে—ডিভোর্স-টিভোর্স?

জবাবে ও-ধারের ফোন নামিয়ে রেখেছেন সুমিত্রা।

পরের একটা মাস বার বার কলকাতায় এসেছেন মঙ্গল ঘোষ। সুমিত্রা কখনো টের পেয়েছেন, কখনো বা পাননি।···মিউজিয়ামে হঠাৎ হানা দিয়ে দেখেছেন, খুপরি ঘরে কৃষ্ণকুমার আচারিয়ার মুখোমুখি বসে সুমিত্রা গবেষণা চর্চায় মগ্ন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তাই দেখেছেন, এসিয়াটিক সোসাইটিতেও। একদিন-দুদিনে নয় দিনের পর দিন। টের পেলে সুমিত্রার মুখে ঘৃণা উপছে উঠতে দেখেছেন। মঙ্গল ঘোষের শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটেছে।

তার পরের মাসের অর্ধেক দিন আর তাঁকে দেখা যায়নি।

কলকাতায় তখন রাজনৈতিক দুর্যোগের শুরু। নানা জায়গায় মারামারি কাটাকাটির খবর বেরুচ্ছে কাগজে। হঠাৎ একদিন কাগজ খুলে আঁতকে উঠলেন সুমিত্রা।...ডক্টর কৃষ্ণকুমার আচারিয়া নামে জনৈক অধ্যাপককে ওমুক নির্জন রাস্তায় রক্তাক্ত অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁকে ওমুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা আশংকাজনক।

দিশেহারার মতো সেই হাসপাতালে ছুটলেন সুমিত্রা। কৃষ্ণকুমারের জ্ঞান নেই তখন। তবে ডাক্তারের আশ্বাস, অবস্থা এখন ততো খারাপ নয়।

হাসপাতালের বাইরে এলেন। তারপরেই স্নায়ুর ওপর হঠাৎ যেন ষষ্ঠ চেতনার ঘা পড়ল একটা। একটা ট্যাকসি ধরে ছুটলেন সেই নামী হোটেলে।

...হ্যাঁ সেই সুইটেই বসে আছেন মঙ্গল ঘোষ। সামনের টেবিলে সেদিনের খবরের কাগজ।

নির্লিপ্তমুখে মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ-সময় কোথা থেকে?

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন সুমিত্রা। জবাবও দিলেন।—হাসপাতাল থেকে। সেখান থেকে ট্যাকসি ধরে তোমার এখানে। ডক্টর কৃষ্ণকুমার এখন আধমরা অবস্থায় হাসপাতালে। কেউ তাকে খুন করতে চেয়েছিল।...তুমি জানো?

তেমনি নির্লিপ্ত জবাব।—হামেশাই তো এই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল।...কাগজে দেখেছি—

—কাগজে দেখেছ! তার বাইরে তুমি আর কিছু জানো না—কেমন?

দু'চোখের এক ঘৃণার ঝাপটা খেয়েই যেন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন মঙ্গল ঘোষ। এগিয়ে এলেন দু' পা।—জানি। বোকাগুলো শুধু তাকে জখমই করেছে, তোমার ওই সুন্দর শরীরের সমস্ত কার্ড

চোখ দিয়ে চাটার জন্য আমি তাকে শুশুনিয়ার কোনো জায়গায় পেলে সোজা গুলী করে খতম করে দিতাম। বুঝলে?

গলগল করে ঘৃণা উপছে উঠছে সুমিত্রার দুই চোখে। অব্যক্ত রাগে স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মঙ্গল ঘোষ যেন অপেক্ষাই করছিলেন। পুলিস এলো। থানায় নিয়ে গেল।

তারপর বিচার। খুনের চেষ্টা অস্বীকার করলেন না মঙ্গল ঘোষ। সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন, আমার স্ত্রীর ওপর দখল নেবার মতলবে ছিল ওই লোক, তাই এ-কাজ করেছেন।

সুমিত্রা ঘোষণা করলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

বিচারে বারো বছরের জেল হল মঙ্গল ঘোষের। সুমিত্রার সঙ্গে পাঁচ মিমিটের সাক্ষাৎ মঞ্জুর হয়েছিল মঙ্গল ঘোষের। কিন্তু সেটা দু'মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়েছে। মঙ্গল ঘোষ হেসেই বলেছেন, বাবার আমলের এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন আমার দীর্ঘ পরমায়ু...বারো বছর বাদে আবার তাহলে দেখা হচ্ছে।

মুখের দিকে চেয়ে তেমনি তপ্ত জবাব দিয়েছেন সুমিত্রা, বারোটা বছর আগে পার করো, তারপর তোমার এই মুখ দেখতে কেমন হয় আমারও দেখার ইচ্ছে থাকল।

গোড়াতেই হঠাৎ ছাড়া পেলে কি হত বলা যায় না। কারণ গোড়ার পাঁচ সাত মাস মঙ্গল ঘোষের প্রায় সবদাহ হত্যার দামামা বাজত মাথায়। কিন্তু ক্রমে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসতে লাগল ভিতর থেকেই। দিন যায় মাস যায় বছর ঘোরে একটা দুটো করে। ভিতরটা খুব শান্ত আর স্থির হয়ে আসছে ক্রমশ। কেবলই মনে হয়, জীবনে এ-রকম একটা কিছুরই যেন প্রয়োজন ছিল তাঁর। ভিতরের অনেক আবিলতা অনেক জঞ্জাল যেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। জেলের

কাজ করেন আর পড়াশুনা নিয়ে থাকেন আর নিজের ভেতর দেখতে চেষ্টা করেন।

রেমিশনের ফলে সাড়ে ন' বছরে ছাড়া পেলেন। তাঁর একটা মাত্র কৌতূহল তখন, ডক্টর কৃষ্ণকুমার আচারিয়া সম্পর্কে তিনি কতটা ভুল করেছেন। চুপচাপ সুমিত্রার খবর নিলেন প্রথম। শুনলেন, প্রায় আট বছর যাবত তিনি তিরুপতির ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিউটের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

...কিন্তু কৃষ্ণকুমার আচারিয়া? তিনি কোথায়?

সে-খবরও সংগ্রহ হল। তিনি লক্ষ্ণৌএ। মঙ্গল ঘোষ ট্রেনে চেপে সোজা লক্ষ্ণৌ এসে উপস্থিত। ইউনিভার্সিটিতে খবর নিতে তাঁর ডেরার সন্ধান মিলল।

সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে দেখলেন ভদ্রলোক কি বই-পত্র নিয়ে বসেছেন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। কৃষ্ণকুমার প্রথমে চিনতেই পারলেন না তাঁকে। আপ্যায়ন জানালেন, বৈঠিয়ে।

মঙ্গল ঘোষ মুখোমুখি বসলেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, চিনতে পারছেন? আমি সুমিত্রা ঘোষের স্বামী মঙ্গল ঘোষ...আপনাকে খুন করার চেষ্টার ফলে সাড়ে ন' বছর জেল খেটে বেরিয়েছি।

শোনামাত্র ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন। মুহূর্তে বিবর্ণ সমস্ত মুখ। সভয়ে ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন একবার।

মঙ্গল ঘোষ সহাস্যে বললেন, ঘাবড়াবেন না, তুই একটা খবর নেবার জন্য আমি আজ বন্ধু হিসেবেই আপনার কাছে এসেছি।...আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কতদিন আগে ছাড়াছাড়ি হয়েছে দয়া করে বলুন।

—সে তো আট বছর আগে। তখনো ভয়ে ঘামছেন ভদ্রলোক।

—কোথায়, কলকাতায়?

শুকনো জবাব এলো, না, ইলোরায়।

—আই সি...আপনারা দুজনে গেছলেন?

—হ্যাঁ, মানে ডিপার্টমেন্টের কাজেই, ওলড রেলিকস নিয়ে কিছু চর্চার ব্যাপার ছিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মঙ্গল ঘোষ।—সেখান থেকে আপনারা এক সঙ্গে কলকাতায় ফেরেন নি?

মাথা নাড়লেন, না। তারপর বিড় বিড় করে বললেন, ডক্টর মিসেস ঘোষ আগে ফিরেছেন।

এবারে আলতো করে মঙ্গল ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, ডিড ইউ প্রপোজ?

ভদ্রলোক আবার আঁতকে উঠলেন যেন।—এ সব কি জিজ্ঞাসা করছেন?

লোকটা ভয় পাওয়ার জন্যেই সুবিধে হল মঙ্গল ঘোষের। তাঁর মুখের ওপর দু'চোখ বিঁধিয়েই আবার বললেন, প্লীজ···আমাকে বন্ধু ভাবুন···আবার আমাকে শত্রু করে তুলবেন না। আপনার মুখ থেকে সত্যি খবরটা শুধু আমার জানা দরকার···আপনি তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কি না?

মাথা নাড়লেন, করেছিলেন। বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনাকে তিনি ঘৃণা করেন, আপনাদের ডিভোর্স ইনএভিটেবল্।

—নেভার মাইণ্ড, আমি তো বলেছি আপনি আমার বন্ধু। কোথায় প্রপোজ করেছিলেন—ইন এ হোটেল্?

মাথা নাড়লেন। তাই।

—অ্যাণ্ড অ্যাট নাইট?

শুকনো মুখ আবারও। আবারও মাথা নাড়লেন। রাত্রিতেই।

মঙ্গল ঘোষ অন্তরঙ্গ হাসি মুখে বললেন, আপনি এখনো কেন ঘাবড়াচ্ছেন ডক্টর আচারিয়া, ও-রকম দুর্বল মুহূর্ত সকলের জীবনেই আসতে পারে—বিশেষ করে আমি যেখানে খুনের আসামী। আর একটি শুধু কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, ডিড ইউ ট্রাই টু গেট হার দ্যাট নাইট?

এবারে কাতর মুখে দু' হাত জোড় করে ফেললেন কৃষ্ণকুমার। বললেন, মিস্টার ঘোষ, এখন আমার বয়েস হয়েছে, এখন আমি সেই রাতটার জন্য লজ্জিত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আর দয়া করে অব্যাহতি দিন। সেদিনের এই কৃষ্ণকুমারের যে মাথার ঠিক ছিল না সেটা মিসেস ঘোষই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

নিজেকে এত হালকা আর কখনো বুঝি মনে হয়নি মঙ্গল ঘোষের। হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, আপনি আমার কত উপকার করলেন ডক্টর আচারিয়া আপনি জানেন না। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

তারপর দু'বছর মঙ্গল ঘোষ দক্ষিণ ভারতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু অন্ধ্রে আসেন নি, তিরুপতিতে আসেন নি। অদম্য বাসনা দমন করে ঠিক বারোটা বছর অপেক্ষা করেছেন। সুমিত্রা বারো বছর বাদে দেখা হওয়ার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বারো বছরের শাস্তির মিয়াদ ফুরোলে ওই মুখ দেখতে কেমন হয় তাঁরও—দেখার ইচ্ছে আছে।

...তারপর বারো বছর বাদে এই সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া আমার নিজের চোখেই দেখা। সুমিত্রা প্রথমে চমকে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু সামলে নিতে খুব সময় লাগেনি। আর সেই সাক্ষাতের ফলাফলও মঙ্গল ঘোষ নিজেই আমাকে জানিয়ে গেছেন।

পুরুষের কাহিনী মোটামুটি এখানেই শেষ। আমারও এখানে আর খুব একটা বড় ভূমিকা নেই। যেটুকু আছে তা উপসংহারটুকু টেনে দেবার মতো। নিজের অগোচরে হয়তো বা তারই আশায় আমি এখানে থেকে গেছলাম।

সুমিত্রা ঘোষ এখানে সুমিত্রা সরকার। মনে মনে আমি একটু হিসেব করে নিয়েছি আর কিছুটা অনুমানের প্রশ্রয়ও নিয়েছি। ওঁদের বিয়ে হয়েছিল তাঁর ফেলোশিপের শেষ মাথায়। বিয়ের পরেই সে-সময় কোনো মেয়ের তাড়াতাড়ি পদবী বদলে নেওয়ার দরকার হয় না। অনুমান, মঙ্গল ঘোষ জেলে যাবার মাস কয়েকের মধ্যে তিনি ডক্টরেট পেয়েছেন। মনের সেই অবস্থায় পদবী বদলে ঘোষ হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ইলোরায় ডক্টর কৃষ্ণকুমারের ভিতরটা অনাবৃত হওয়ার পর সুমিত্রা একলা কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন। তারপর আত্মীয়-পরিজনশূন্য এই অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ নিয়ে আর হয়তো বা দেবতার সেবা নিয়ে এখানে পড়ে আছেন। আমার ধারণা আগের পদবী আছে বলেই আছে, তা নিয়ে আর মাথা ঘামানো দরকার হয়নি বলেই আছে। মঙ্গল ঘোষের মানুষ চেনার কোনো মূল্য তিনি দেননি এমন হতে পারে না। না দিলে ডিভোর্স হত, এই সুদূরে এসে কাজ বা সেবা নিয়েও তিনি পড়ে থাকতেন না। রসের-অনুশীলন তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল। হয়তো বা এতবড় ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে-রস অসীমের দিকে এগোলে ব্রহ্ম—তারই ওপর নির্ভর করে দিনযাপনের পথ খোঁজা শুরু করেছিলেন।

…সুমিত্রা ঘোষের সঙ্গে আমার সেই সকালেই দেখা হয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি সবে তখন বাইরে পা বাড়িয়েছেন। আমাকে দেখে বিব্রত বোধ করলেন।

বললাম, কাজে বেরুচ্ছেন ?

…হ্যাঁ, ইনস্টিটিউটে যাবার সময় হয়েছে।

—ব্যস্ত হবেন না তাহলে, যান…মঙ্গলবাবু আজ সকালেই চলে গেলেন, আমি একলা মানুষ, ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।

মঙ্গল ঘোষ চলে গেলেন শুনে চকিতে একবার তাকালেন আমার দিকে। কেন যেন সেটুকুই বেশ আশাপ্রদ মনে হল আমার কাছে।

পাশাপাশি আসতে আসতে তিনি বললেন, আপনাকে মন্দির দেখানোর কথা, আজ তো হলই না, কাল সকালেও হবে না…পরশু ছুটি, পরশু সকালে আসুন—অসুবিধে হবে ?

হেসে জবাব দিলাম, কিছু না, আমাকে খুব একটা ধার্মিক লোক ধরে নেবেন না যেন।

বিমনার মতো একটু হাসলেন তিনিও। আরো কয়েক পা এগোতে সে ভাবটা গেল। বললেন, এক্ষুনি আপনাকে ফিরতে হচ্ছে…বিকেলে এলেও খানিক কথা বলা যেত। সেই কতকাল আগে আপনাদের লেখা-পত্র পড়েছি, তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে গেছে।

হেসে জবাব দিলাম, অনেক বাজে সময় নষ্ট হওয়ার থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন।…বিকেলে নিশ্চয় আসব, আমার তো সময় কাটা ভার এখন।

গেছি। আজ, কাল দু'দিনই। সুমিত্রা সহজ অভ্যর্থনায় ঘরে বসিয়েছেন আমাকে। নিজে চা করে খাইয়েছেন। এখানে মহিলা কর্মীদের সকলের দু'খানা করে ঘর—দু'বেলার খাওয়ার ব্যাপারটার শুধু মিলিত ব্যবস্থা।

দু'দিনই সুমিত্রা বাংলা গল্প উপন্যাস কবিতা সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার নিজস্ব লেখার আলোচনাও উপস্থিত

করলেন। আর আমার দিক থেকে তাঁর এখানকার দিন-যাপনের ধারা আর কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা।

এই দুটো বিকেলের মধ্যে মঙ্গল ঘোষ নামে কোনো মানুষকে দুজনের কেউ চিনি এমন ইংগিতও প্রকাশ পেল না।

তৃতীয় দিন সকালে চায়ের সঙ্গে বড় এক প্লেট হালুয়াও এলো। বললেন, ভালো করে খেয়ে নিন, ফিরতে দেরি হবে।...দুপুরেও এখান থেকেই খেয়ে যাবেন বলে রেখেছি।

মহিলার চালচলনের এই সহজ সত্তার দিকটাই যেন লক্ষণীয় আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার খাবার কোথায়?

সামান্য মাথা নাড়লেন, আমি এখন না...।

অর্থাৎ, মন্দিরে যাচ্ছেন তাই এখন কিছু চলবে না। এই নিষ্ঠা দেখে আবার ভিতরে ভিতরে দমে গেলাম একটু।

পাশাপাশি মন্দিরের দিকে চলেছি। কেন যেন ভারী ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এই মহিলার জন্য মঙ্গল ঘোষের বারো বছর অপেক্ষা করাটা খুব যেন বড় কিছু নয়।

মন্দিরের সামনে ভিড় দেখে বললাম, দেবতা দর্শন করতে পনের-ষোল ঘণ্টাও কিউতে দাঁড়াতে হয় শুনলাম?

—হয় অনেক সময়, আপনার হবে না।

সত্যিই সর্বত্র অবারিত দ্বার তাঁর। তাঁর প্রতি দ্বাররক্ষীদের একটা বিনম্র শ্রদ্ধার ভাবও দেখলাম। ভিতরে ভিতরে এও আমার দমে যাবার কারণ একটু, ভদ্রমহিলা কি সত্যিই এখানকার সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন নাকি!

একে একে বাইরের আর ভিতরের সবকিছু দেখিয়ে চললেন আমাকে, কোনটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এর যেন শেষ নেই আর। গর্ভ গৃহ আর তার বিগ্রহাদি, মূল বিগ্রহের প্রতিমূর্তি, ভোগশ্রীনিবাস, উগ্রশ্রীনিবাস, পেরুমলের বহিরোৎসবের বিগ্রহ মন্দিরের ভাস্কর্যাদি, প্রতিমা মণ্ডপ, আয়নামহল, ধ্বজাস্তম্ভ মণ্ডপ,

কল্যাণ মণ্ডপ, তিরুপতির যানবাহনাদি, রামানুজ মূর্তি—ইত্যাদি কত কিছু যে দেখালেন আর তার ইতিবৃত্ত বলে গেলেন স্মরণ রাখা দায়।

সব শেষে মূল বিগ্রহ সন্নিধানে। প্রভু ভেঙ্কটেশ্বরের স্থানক মূর্তি। উচ্চ পদ্মের আসনে দাঁড়িয়ে। কম করে ন' ফুট হবে দীর্ঘ। ঝলমল করছে সর্বাঙ্গের আভরণ। লম্বিত বাহু। শুনেছি প্রসন্ন-সুন্দর এই বিগ্রহ-মুখের তুলনা নেই। কিন্তু এই মুখটিই দেখা গেল না। কারণ বিগ্রহের কপাল থেকে অধরের ওপর পর্যন্ত পুরু কর্পূরের প্রলেপে ঢাকা। শুধু শুক্রবারের অভিষেকের দিন এই প্রলেপ তুলে ফেলে নতুন কর্পূরের প্রলেপ দেওয়া হয়। সেই দিনই শুধু কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত মুখটি দেখা যায়।

পাশের মহিলাকে বললাম, অত বড় পুরু কর্পূর-প্রলেপে দেবতার কপাল আর চোখ-মুখ ঢেকে রাখার সম্পর্কে গল্প আছে—তাই না?

সুমিত্রা বললেন,···প্রভুজীকে নিয়ে কত গল্পই তো আছে।

কিন্তু আমার মনে যা এসেছিল তা আর তখনকার মতো বললাম না।

তাঁর সঙ্গে ঘরে ফিরতে বেলা প্রায় তিনটে। তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন সুমিত্রা। এবারে সামনে বসেই খেলেন তিনিও। পরিচ্ছন্ন কিন্তু সাদাসিধে নিরামিষ খাওয়া। তিরুপতিতে আমিষ অচল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি একটা চেয়ারে বসলাম। তিনি খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, আপনার আজ খুব পরিশ্রম হল।

বললাম, পরিশ্রমটা আমার থেকে আপনারই ঢের বেশি হয়েছে।

একটু বাদে হঠাৎ-ই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আর কত দিন আছেন এখানে?

যে জবাবটা ফস করে বেরিয়ে এলো তার জন্য আমি নিজেও কি প্রস্তুত ছিলাম! বলে ফেললাম, সেটা অনেকখানি আপনার ওপর নির্ভর করছে।

নীরব বিস্ময়ে দু'চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে।

ভিতরে ভিতরে শংকা বোধ করছি, কিন্তু কেন যেন মনে হল এই মহিলা আর যা-ই হোক অকরুণ হতে পারেন না।

কপাল ঠুকে মনের কথা ব্যক্ত করে ফেললাম।—যাবার সময় মঙ্গল ঘোষ আপনাকে নাকি বলে গেছলেন, আজ হোক কাল হোক দু'-পাঁচ বছর পরে হোক, আপনার বিবেকই আপনাকে তাঁর কাছে ঠেলে পাঠাবে···আর বলেছিলেন নাকি, আপনার মন্দিরের ওই পুরুষোত্তমের মধ্যে যদি পুরুষের ছিটেফোঁটাও থাকে, সে আপনাকে রেহাই দেবে না—তখন যেন সব সংকোচ বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার মতো জোরটুকু থাকে আপনার।

মুখে লালের আভা দেখছি। খুব সদয়ও মনে হচ্ছে না সেটুকু। চেয়ে আছেন তেমনি। তবু আবার বললাম, তাঁর সেই প্রতিটি কথা সত্যি হবে বলে আমারও বিশ্বাস। তিনি তাঁর হয়ে আপনার কাছে কোনোরকম ওকালতি করতে নিষেধ করে গেছেন। তবু বলছি, তাঁর প্রতীক্ষার মেয়াদ আর দীর্ঘ না করলেই নয়?

মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছেন। গলার স্বর অনুচ্চ কিন্তু তেমন বিনম্র নয় আর।—আপনি সবকিছু জানেন?

—সব জানি। কিছুই তিনি গোপন করেননি।···কিন্তু এই একটা মাস সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে থেকে আমি আরো এমন কিছু জানি যা আপনি জানেন না।

তেমনি ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখ, কিন্তু চোখে একটু নীরব জিজ্ঞাসা।

আমি বলে গেলাম, তাঁকে আমার চেনা শুরু হয়েছে হাওড়া স্টেশান থেকে। আমার স্ত্রী আর মেয়ে আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন। আমার জন্য তাদের উতলা মন বাঙ্কের ওপর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। মাদ্রাজে পৌঁছেও বাড়িতে একখানা চিঠি লেখা হয়নি শুনে তাঁর সেই বিরক্তি আর রাগ মনে রাখার মতো, বলেছিলেন, ভাগ্যে ভাববার মতো লোক পেয়েছেন বলেই তাদের ভাবাতে হবে, কেমন?

তিনি নির্বাক চেয়ে আছেন। আমি বলছি।—

কাঞ্চিপুরমের প্রধান পাণ্ডার মেয়েদের প্রতি কলুষিত দৃষ্টি একমাত্র তিনিই চিনেছিলেন। তার ওপর পছন্দ মতো টাকা না পেয়ে সেই পাণ্ডা আমাদের বাঙালী জাত তুলে গাল দিয়েছিল। একমাত্র মঙ্গল ঘোষ তার সমুচিত জবাব দেবার ফলে আমাদের গোটা দলটা পাণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। মেয়েদের প্রতি প্রধান পাণ্ডার আচরণের নজির তাঁর ক্যামেরায় তোলা আছে সেই হুমকি দিয়ে আশ্চর্য তৎপরতায় তিনিই সমস্ত বিপদ কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

···অবকাশ সময়ে সারাক্ষণ একটা বইয়ে ডুবে থাকতেন তিনি। বইটার নাম 'দি সেলফ'। সে-বই আমি পড়েছি। সত্তার গভীরতা ভিন্ন কেউ ও-রকম বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে পারেন না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন মহিলা। আমি বললাম, আরো একটু শুনে নিন।···এক মেয়েকে নিয়ে একজন শক্তিমান যুবার সঙ্গে একটি পরদেশী প্রৌঢ় ডুয়েল লড়ে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তিরুচির রক টেম্পলএ উপোস করে আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে পড়েছিল। অসীম দরদে খাইয়ে দাইয়ে কিভাবে মঙ্গল ঘোষ তাকে জীবনের পথে ফিরিয়েছেন, সে শুধু আমরা চেয়ে চেয়ে দেখেছি।

—আরো শুনুন। ভালোবাসার বিয়ের পর বিশ্বাসঘাতক স্বামী পরিত্যক্তা একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে ছিল। নাম স্মৃতিকণা, সুন্দর গান গায়। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে ওই স্বামীর সংকটাপন্ন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় ধর্ণা দিয়ে পড়েছিল। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যেতেও কেউ জানে না সে কোথায়। মঙ্গল ঘোষই শুধু ছুটে বেরিয়ে গেছলেন তাঁর খোঁজে—ট্রেন ছেড়ে গেলে যাবে। আমরা সুদ্ধু তখন তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার পর অনুভব করেছি কত নরম অন্তঃকরণ ওই বেপরোয়া মানুষটার। এককালে গানের স্কুল করার সখ ছিল স্মৃতিকণার। তার দুঃখের জীবন জানার পর তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আমার কিছু বাড়তি জঞ্জাল অর্থাৎ টাকা

জমে আছে দিদি—সত্যিই যদি নিজের গানের স্কুল করতে চাও, ফিরে গিয়ে বাঁকড়োর এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

ঘরের মধ্যে বিকেলের আলো যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। সুমিত্রা নির্বাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জেল থেকে বেরিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে তিনি কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সে খবরও আপনি শুনেছেন আশা করি ?

সামান্য মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। স্থির নির্বাক আরো খানিকক্ষণ। তারপর স্পষ্ট মৃদু স্বরে বললেন, কৃষ্ণকুমারকে দেখে তাঁর ভিতর চিনতে ভুল হয়নি জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও অবিশ্বাস করে ওই লোককে তিনি খুন করতে চেয়েছিলেন সেটা ভুলব কি করে ?

জবাব দিলাম, আমার বিবেচনায় সেটাই আপনার সব থেকে ভু- চিন্তা। আপনার প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না।

সোজা মুখের দিকে তাকালেন আবার। ঈষৎ কঠিন সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্ন ছিল না আপনি জানলেন কি করে ?

আমি হাসতে লাগলাম। তারপর বললাম, আপনাদের প্রভু ভেঙ্কটেশ্বরের কপাল থেকে নাকমুখ পর্যন্ত কর্পূরের প্রলেপে ঢাকা থাকার প্রসঙ্গে আমি যে গল্পটা জানি সেটা শুনবেন দয়া করে ?

হঠাৎ এই প্রসঙ্গান্তরের কারণ ঠাওর করতে পারলেন না তিনি। চেয়ে আছেন।

বললাম, একটা বইএ পড়া গল্প, কিন্তু এই প্রসঙ্গে বড় বেশি মনে পড়ছে।···রামানুজের শিষ্য অনন্তার্যের ওপর প্রভু তিরুপতির ফুলের বাগান সংরক্ষণের ভার ছিল। সেই ফুল বাগান সাজানোটা অনন্তার্য প্রভুর কাজ বলেই ভাবতেন। তিনি একদিন কোদাল দিয়ে বাগানের মাটি কেটে সমান করছিলেন, আর ঝুড়িতে সেই মাটি মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই কাজ করতে গিয়ে স্ত্রীটি ভারী ক্লান্ত শ্রান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়লেন, আর মাটি বইতে

পারেন না এমন অবস্থা। তাই দেখে স্বয়ং প্রভু তিরুপতি এক তরুণ ব্রহ্মচারীর বেশ ধরে এসে মাটি সরানোর কাজে স্ত্রীটিকে সাহায্য করতে লাগলেন। দূর থেকে তাই দেখে সন্দেহে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অনন্তার্য। সোজা এসে কোদাল দিয়ে সেই ব্রহ্মচারীর মুখে বিষম আঘাত করে বসলেন।·· ব্রহ্মচারীকে আর দেখা গেল না। তার পরেই অনন্তার্য মন্দিরে এসে দেখেন বিগ্রহের মুখ আর চিবুক দিয়ে অঝোরে টাটকা রক্ত ঝরছে। অনন্তার্য সত্রাসে বুঝলেন কাকে আঘাত করেছেন। হায় হায় করে ত্বরিতে প্রভুর সেই ক্ষতর ওপর কর্পূরের প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন তিনি। প্রভু তিরুপতি শুধু যে তাঁকে ক্ষমা করলেন তাই নয়, অনন্তার্যের পত্নিপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সেই কর্পূর-প্রলেপ অলঙ্কারের মতো চিরদিন ধারণ করে থাকলেন।

···দেখছি, সুমিত্রার মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। আমার দিকেই অপলক চেয়ে আছেন তিনি। আস্তে আস্তে বললাম, ঘটনাচক্রে এত বড় প্রভুভক্ত যদি পত্নিপ্রেমে অন্ধ হয়ে এ-কাজ করে এমন ক্ষমা পেতে পারেন, সে তুলনায় মঙ্গল ঘোষের কাজটা কি এমনি চিরকালের ক্ষমার অযোগ্য। একটানা বারোটা বছর কি তিনি যথেষ্ট মাশুল দেন নি?

···মহিলার সেই দুটো চকচকে চোখ, স্ফীত নাসা আর আরক্ত মুখ দেখে আর অবস্থান সমীচীন মনে হল না। নিঃশব্দেই চলে এলাম।

•

পর পর চারদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটল আমার তারপর। এবারে তিনি আসবেন আমার এখানে আশা করেছিলাম, অপ্রত্যাশিত কিছু বলবেন আশা করেছিলাম। শেষে আর থাকতে না পেরে নিজেই গেলাম সকালের দিকে।

গিয়ে দেখি দুটো ঘরই তালাবন্ধ।

বিকেলে এলাম। তখনো তালাবন্ধ

অদূরের অফিস ঘরে খবর নিতে গিয়ে হতভম্ব আমি। কর্মরত মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি ফিরে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মিস্টার মুখার্জী ?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

তিনি বললেন, দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে গত পরশু সুমিত্রা দেবী কলকাতা চলে গেছেন। আপনার জন্যে আমার কাছে একটা চিঠি রেখে গেছেন।

খামটা খুলে তক্ষুনি পড়লাম। একটা লাইন মাত্র লেখা :

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

—সুমিত্রা ঘোষ

বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের এ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। চোখের কোণ দুটো আনন্দে শিরশির করছে কেমন। দূরে তিরুপতির মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

আমার ভিতরের কেউ যেন দু'হাত তুলে মনে মনে প্রণাম সেরে নিচ্ছে একটা।

সে প্রণাম পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে কি কোনো পুরুষের উদ্দেশ্যে আমি জানি না।